জননী দেবী

সমরেশ মজুমদার

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

JANANI DEBI
A novel by SAMARESH MAJUMDAR
Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR.
C-3, College Street Market
Calcutta-700007 (lst floor)

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৯

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রণে ঃ
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং হাউস
৬৯।১।১ বি, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

ব্লক ঃ
বি, ডি, কনসার্ন

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণে ঃ
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

দিল্লি হয়ে বৃন্দাবনে পৌঁছে নাকে রুমাল চাপল চিন্ময়। এত ধুলো যদি একসঙ্গে ওড়ে তাহলে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। এমনিতেই ধুলোতে তার এলার্জি আছে। তীর্থ করতে যাঁরা বাস থেকে নেমেছিলেন তাঁরা সেই ধুলো মাড়িয়ে ছুটে গেলেন বিভিন্ন মন্দির দর্শনে। চিন্ময় নাকে রুমাল চেপে একটু পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাল। বৃন্দাবনের যে অংশ সে দেখতে পাচ্ছে তা মোটেই শ্রীমণ্ডিত নয়। বরং বেশ জীর্ণ ঘরবাড়ি, পুরোন ধুলোট, দোকানপাট যা এসব অঞ্চলে দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। দিল্লি থেকে আগ্রা যাওয়ার পথে চিন্ময় নেমেছে এখানে কারণ ট্যুর প্রোগ্রামে বৃন্দাবন ধরা আছে। যাঁরা এসেছেন তাঁরা তাজমহলের সঙ্গে পুণ্য লাভ করে নিতে চান। হাতে ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে।

বৃন্দাবন নিয়ে চিন্ময়ের আগে কখনও কৌতূহল ছিল না। এককালে বাঙালি পিসিমা-মাসিমারা সংসার ছেড়ে যে দুটো জায়গায় যেতেন তার একটা যদি কাশী হয় অন্যটি হল এই বৃন্দাবন। বাংলা সাহিত্যের বিধবা পিসিরা শেষ কবে এসেছেন এখানে মনে করতে পারল না চিন্ময়। বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থ বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থান নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু এখানে নামার পর চিন্ময়ের হাঁটাচলা করার আগ্রহ উবে গেল। কণ্ট্রাক্টেড ট্যুরের এই মুস্কিল, ইচ্ছে না হলেও থাকতে হবে কিছুটা সময়। চিন্ময় চারপাশে তাকাল। একটু ভদ্র গোছের চায়ের দোকান পেলে খারাপ লাগত না। এই সময় একটা রিক্সা এসে দাঁড়াল তার সামনে। রিক্সা থেকে নেমে একটি কাঠখোট্টা চেহারার তরুণ পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'বাবু, বৃন্দাবন দেখবেন না?'

'তুমি বাঙালি?' এরকম জায়গায় বাঙালি রিক্সাওয়ালাকে দেখতে পেয়ে ভাল লাগল চিন্ময়ের।

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার রিক্সায় বসে ঘোরা যাবে তো?'

'তা যাবে। তবে মাঝে মাঝে হেঁটে মন্দিরে ঢুকতে তো হবে। এই যেমন সোনার তালগাছ, রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবন এসব তো হেঁটেই দেখবেন। যমুনা নদীর ধারে আমি আপনাকে রিক্সায় নিয়ে যাব, হাঁটতে হবে না।' খুব আন্তরিক গলায় কথা বলছিল সনাতন।

'যমুনা? যমুনা এখান থেকে কতদূর?' এই প্রথম চিন্ময় কৌতূহলী হল।

'কাছেই। যেতে আসতে দশ মিনিট লাগবে।'

'ধর, যদি শুধু যমুনা দেখে আসি তা হলে কত নেবে?'

'দুটো টাকা দেবেন। কিন্তু বৃন্দাবনে এসে শুধু যমুনা দেখে ফিরে যাবেন?'

চিন্ময় হাসল, 'তোমাদের এই যমুনাতে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করেছিলেন না?'

'হ্যাঁ বাবু। বড় পবিত্র নদী। ওর জল মাথায় ঠেকালেও পুণ্য হয়।'

'চল, ওইটুকু পুণ্য করে আসি।' চিন্ময় রিক্সায় উঠে আরাম করে বসে বলল, 'যদি কোন ভাল চায়ের দোকান পথে পড়ে তা হলে একটু দাঁড়িও।'

'খুব ভাল দোকান আছে বাবু, তেওয়ারির দোকান। ওর চা একবার খেলে জীবনে ভুলবেন না। একেবারে অমৃত।' সাইকেলরিক্সায় উঠে পড়ল সনাতন।

চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে রুমাল সরাবার কথা ভুলল না চিন্ময়। বন্ধুরা তাকে একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ বলে জানে। সব কিছুর সঙ্গে লাগাম ছাড়া মিশে যাওয়ার অভ্যেস তার নেই। হঠাৎ কথাটা মনে হতেই হেসে ফেলল চিন্ময়। ধুলোমাটিতে বিচরণ না করলে জীবন দেখা যায় না। মানুষের কথা বলতে গেলে মানুষের মধ্যে মিশে যেতে হয়। জানলা দিয়ে দেখলে সেটা হয় সাজানো। সবাই প্রশ্ন করেছে এত বাস্তব, এই কঠোর সত্যি আপনি

জানলেন কি করে? এ তো নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া হয় না। ইদানীংকার বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক সে। লিখে পেরে উঠছে না বলে প্রকাশক ফিরিয়ে দিতে পারে স্বচ্ছন্দে। এই মুহূর্তে সে-ই একমাত্র লেখক যে শুধু লেখার টাকার ওপর বেঁচে আছে। এবং বেশ ভালভাবেই। গত বছর একজন পাবলিশার্সের কাছেই বই বিক্রি বাবদ রয়ালটি পাওনা হয়েছিল দেড় লাখ। ইনকাম ট্যাক্সের জ্বালায় চল্লিশ ভাগ বেরিয়ে যাচ্ছে। তা সেই পাবলিশার্সকে সে অনুরোধ করেছিল একটা ফ্ল্যাটের জন্যে।। মানিকতলার ভাড়া বাড়িতে পোশাচ্ছিল না। পাবলিশার্স অ্যাডভান্স দিয়েছে সানন্দে। সেই টাকায় লেক গার্ডেন্সে তিন ঘরের ফ্ল্যাট কিনেছে চিন্ময়। সাজানো গোছানো আধুনিক ফ্ল্যাট। পাড়ায় ধুলোর নামগন্ধ নেই। সে একটা আলাদা ঘর পেয়েছে লেখার জন্যে। মানিকতলায় হুটহাট লোকজন এসে যেত। তার ফ্ল্যাট দেখাশোনা কাম রান্নাবান্না করে ধরণীদা। বহুৎ পুরোন মানুষ। নিজের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে চিন্ময়। তা সেই ফ্ল্যাটে এসে জীবনের গল্প বলা আর রিক্সা থেকে বৃন্দাবন দেখা একই ব্যাপার। সাততলার ওপরে সড়সড় করে লিফটে চেপে উঠে গিয়ে চিন্ময় যাদের কথা লিখছে তারা পড়ে যদি ভাবে ওটা তাদেরই গল্প তা হলেই হয়ে গেল। এবং সেটা হচ্ছেও। একজন প্রবীণ লেখক তাকে বলেছিলেন 'কারো কারো এরকম সময় আসে সেই তখন যা লিখছে তাই পাঠক নিচ্ছে। তারপর সময়টা যখন চলে যায় তখন পাবলিশার্সদের দেখা আর পাওয়া যায় না। তোমার এখন সময় চলছে, করে খাও।' তার দ্বিতীয় এক পাবলিশার্স মোটা দামের বই খবরের কাগজে বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তাই দেখে একজন বয়স্ক লেখক, যাঁর বই পাবলিশার্সের ঘরে আছে, ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে বলেছিলেন, আর আমাদের বই ছাপবেন কেন? আপনারা বড় লেখক পেয়ে গেছেন।' এসব কথাবার্তা শুনেও নিজেকে কি করে নির্লিপ্ত রাখা যায়, তা আয়ত্ত করে ফেলেছে চিন্ময়। যদ্দিন লোকে তার লেখা পড়বে সে লিখে যাবে। তা সাততলায় জানলা দিয়ে দেখা জীবন নিয়ে হোক আর এই রিক্সায়

রুমাল নাকে চেপে বসে বৃন্দাবন দেখাই হোক। না, বৃন্দাবন নিয়ে সে কিছু লিখবে না। কারণ বৃন্দাবন এখনও তাকে টানছে না। যে টানে না সে গল্পে আসে না।

সনাতন রিক্সা থামাল, 'বাবু, ওই হংস তেওয়ারির দোকান। যাওয়ার পথে চা খেয়ে যাবেন, না ফেরার সময় নামবেন?'

কাঠের বেঞ্চিপাতা বিশাল চালাঘরের দোকান। ড্রাম, উনুন, ছোট মিষ্টির শোকেস আর বেশ কিছু খদ্দের দেখে পুলকিত হবার কিছু নেই। কিন্তু দোকানদার দোকানের সামনে বেশ জল ছড়িয়েছে যাতে ধুলো না ওড়ে। তেষ্টা পেয়েছিল। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে?'

'না বাবু। আমি কোন নেশা করি না।' সনাতন দাঁত বের করে হাসল।

চিন্ময় ইতস্তত করল। সে চা খেতে যে সময় নেবে তার জন্যে সনাতনের লোকসান হয়ে যাবেই। সনাতন সেটা বুঝল, 'আপনি চা খেয়ে নিন। আমার কোন অসুবিধে নেই।'

সাবধানে দোকানে ঢুকল চিন্ময়। বেঞ্চির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কাউন্টারে বসা বিশাল ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক বাংলা-হিন্দী মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বলিয়ে নতুন বাবু। কি খাবেন বলিয়ে দিন জলদি পেইয়ে যাবেন।'

'শুধু চা। আপনার দোকানের চা নাকি খুব ভাল!'

'সবই গোপালের আশীর্বাদ। এই মনা, বাবুকে লিয়ে চা। জলদি'। লোকটা হাসল, 'আপনি বৃন্দাবনে এর আগে আসিয়েছেন?'

'না। এই প্রথম।' সাবধানে বেঞ্চিতে বসল চিন্ময়।

'তিন দিন থাকিয়ে যান। বৃন্দাবন মন ভরিয়ে দেবে আপনার। এই যে ধুলা দেখছেন, এই ধুলায় গোপালজীর পায়ের পরশ আছে।' লোকটি আবার তার কাজে মন দিল।

চিন্ময় দেখল কাঁচের গ্লাসে চা নিয়ে আসছে বছর দশেকের ছেলে। তার হাফ প্যান্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা। উর্ধাঙ্গ খালি। গ্লাসটা ওর হাত থেকে

নিয়ে চিন্ময় নেহাত কথা বলার জন্যেই জিজ্ঞাসা করল, 'ে য়া নাম তুমারা?'

বালক মুখ নিচু করল, 'মনা। মা ডাকত মনা, মনোরঞ্জন।'

'তুমি বাঙালি?' হতভম্ব চিন্ময়।

'হু।'

'এখানে তোমার মা-বাবা থাকে?'

'না। বাবা নাই। মা চইলা গ্যাছে।'

'কোথায়?'

জানি না।'

'থাকো কোথায়?'

'ইখানে।'

'দেশ কোথায় ছিল?'

'জানি না।' মনা ফিরে গেল।

মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল চিন্ময়ের। একটা বাঙালি বালক বৃন্দাবনে চায়ের দোকানের অনাথ হয়ে কাজ করছে। এটা খুব অস্বাভাবিক ঘটনা কি? এতে তার মন খারাপ হবার কি কারণ থাকতে পারে? এর উত্তর জানা নেই তার কিন্তু কোন শক্তি দিয়ে মন খারাপ হওয়া সে আটকাতে পারছে না।'

চা খেয়ে কাউন্টারে গিয়ে ভুঁড়িওয়ালা লোকটিকে দাম মিটিয়ে দিয়ে চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'এই মনা ছেলেটিকে কোথায় পেলেন?'

লোকটি হাসল, 'এ জায়গা ভগবানের। তাঁর লীলায় কত মানুষ আসে, কত মানুষ যায়। সেইরকম ও'ভি ভাসতে ভাসতে এল, আমি রাখিয়ে দিলাম। কেন বাবু?'

চিন্ময় মাথা নাড়ল, 'কিছু না। সে বালকের দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল।'

এটাই মুস্কিল চিন্ময়ের। হঠাৎ হঠাৎ ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। একটি বালক বনগাঁর চায়ের দোকানে কাজ করছে দেখলে যে প্রতিক্রিয়া হত না, তা বৃন্দাবনে হচ্ছে। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সে এই কারণেই আটকে

গিয়েছে। মুহূর্তের কোন ঘটনা এমন ভাবে গেঁথে যায় মনের ভেতরে যে তাই অন্য চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে লেখায়। রিক্সা চলতে শুরু করলে মাথা নাড়ল চিন্ময়। বন্ধুরা বলে তার জীবনযাপনের মধ্যে লেখক-সুলভ কোন ব্যাপারই নেই। আবেগ জিনিসটা নাকি সে ছেঁটে বাদ দিয়েছে। সাহিত্যকে জীবিকা হিসেবে নেবার পর যে কলম ধরে এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততায়। এরকম কত কথা। এই বালকটিকে নিয়ে লেখার ভাবনা এই মুহূর্তে তার হচ্ছেই না। যাকে জানল না তাকে নিয়ে লেখার বাসনাই তার নেই।

সনাতন বলে উঠল, 'ই যে বাবু, সোনার তালগাছ। আর এদিকে রাধাকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ।'

চিন্ময় দেখল ভক্ত ট্যুরিস্টরা পাগলের মত ছোটাছুটি করছেন এ মন্দির থেকে সে মন্দির। সে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল হে, বাস আমার একার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

সনাতন বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না বাবু। ঠিক সময়ে ফিরিয়ে আনব আপনাকে।'

রাস্তা ক্রমশ সরু হচ্ছিল। এখন আর ধুলো নেই। পাকা রাস্তা সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে যাওয়ার সময় রিক্সার গতি কমে এল। কারণ পথে বেশ ভিড়। চার চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি, দোকান সাজিয়ে বসে থাকা বিক্রেতা থেকে আরম্ভ করে মানুষের আনাগোনা। তাদের সামনে রিক্সাওয়ালাকে যেতে হচ্ছিল। চিন্ময়ের নজরে পড়ল আশে-পাশের বাড়ির বারান্দায় বিধবা মহিলাদের ভিড়। কেউ গল্প করছেন, কেউ কুটনো কুটছেন। কারো বয়স পঞ্চাশের কম নয়। একটু ঠাওর করতে বুঝতে পারল এরা বাঙালি। দু'জন পরস্পরের সঙ্গে বাঁকুড়ার ভাষায় ঝগড়া করছেন তারস্বরে। অর্থাৎ এটি বিধবা বাঙালিদের পাড়া।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'সনাতন, এখানে প্রচুর বাঙালি বিধবা আছেন, না?'

'হ্যাঁ বাবু। তা শ' তিন সাড়ে তিন তো বটেই।'

'কিভাবে চলে ওঁদের?'

'চলে যায়। কারো কারো দেশ থেকে টাকা আসে, একটু আধটু।

চাজকর্ম করে কেউ কেউ, আর একেবারে থুখ্‌রেরা ভিক্ষে করে। এক-বেলা গোপালের ভোগ খেয়ে অনেকে বেঁচে থাকে। হিন্দু বিধবা তো, বড় কড়া প্রাণ।' রিক্সার প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে কথাগুলো বলছিল সনাতন। তার দেহ উঠছে নামছে। বেশ ঘেমে গেছে এর মধ্যে। রাস্তা আরও সরু হয়ে গেছে। এখন আর পিচ নয়। সিমেণ্ট বাঁধানো গলি দিয়ে চলছে রিক্সা। তার ঘন্টির আওয়াজে পথচারীরা সরে যাচ্ছে দেওয়াল ঘেঁষে। বেশির ভাগই বৃদ্ধা মহিলা, পুঁটুলি নিয়ে যেভাবে চলেছেন তা স্নানার্থিনী বলেই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ গলি শেষ হল। রিক্সা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতেই চিন্ময়ের যমুনা-দর্শন হল। সনাতনকে বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও।'

সনাতন ব্রেক কষল।

চিন্ময় বিড়বিড় করল, 'এই যমুনা!' তার চোখের সামনে বিশাল চওড়া একটা নদী যার বুকে কাশবন, বাড়ি ঘরদোর, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বেশ পোক্ত বলেই মনে হচ্ছে। একবারে তীরের কাছে সাত-আট গজ জল থিতিয়ে আছে। যার গভীরতা আধ ফুটের বেশি নয়। এই জল স্রোতহীন।

সনাতনের কানে চিন্ময়ের বিস্মিত উচ্চারণ পৌঁছেছিল। সে বলল, 'হ্যাঁ বাবু। ইনিই হলেন যমুনা নদী। এই নদীর জল মানুষের কাছে বড় পবিত্র। ওই যে ওইখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করেছিলেন।' হাত বাড়িয়ে কাশগাছওয়ালা বালির চর দেখিয়ে দিল সনাতন। মনে মনে নিজের ওপর বেদম রেগে গেল চিন্ময়। এই অসময়েও চরের মধ্যে দু-তিনটে লোক নির্লিপ্ত মুখে প্রাকৃতিক কর্ম করছে। এই দেখতে সে এত দূরে এল?

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই জলটুকু কোত্থেকে এল সনাতন?'

'জানি না বাবু। কিছু জীব তো ওখানে বাস করে?'

'জীব? ওইটুকু জলে? মাছ আছে নাকি?'

'না। বাবু মাছ কি করে থাকবে? একটু কাছে গিয়ে লক্ষ্য করুন, মাছের মতনই।'

কৌতুহলী চিন্ময় রিক্সা থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে ঘাট দেখতে পেল। খুব প্রাচীন ঘাট সামনে। আশেপাশে একই রকম অনেক ঘাট দেখতে পেল। সিঁড়িগুলো খটখটে। পায়ে পায়ে সে নেমে এল জলের কাছে। আধ ইঞ্চি স্থির জলে কিলকিল করছে ব্যাঙাচি। এত ব্যাঙাচি সে একসঙ্গে কখনও দ্যাখেনি। ছেলেটা যে এমন রসিকতা করতে পারে তা মুখ দেখে বুঝতে পারেনি।

ওপরে উঠে আসছিল চিন্ময়। এমন সময় তার নজর পড়ল সিঁড়ির কোণে একজন বসে আছে ঘাড় গুঁজে। পাশে পুঁটুলি, একটা মগ, বালতি। বৃদ্ধাকে দেখে স্নানার্থিনী বলে মনে হচ্ছে না। পাশ দিয়ে উঠে আসার সময় হঠাৎ কান্নাব শব্দ কানে এল। চিন্ময় দাঁড়িয়ে গেল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বৃদ্ধা কাঁদছেন। সে দেখল ভাল করে। বৃদ্ধার শরীরে যে থানটি জড়ানো তা শতচ্ছিন্ন হলেও এখনও ফরসা। চেহারার যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বাঙালি বলেই মনে হল তার। কিছু না ভেবে সে কাছে এগিয়ে গেল, 'মা, আপনার কি হয়েছে?'

'মা? কে মা বলে।' বৃদ্ধা অন্ধের মত হাত বাড়ালেন। শীর্ণ, শির ওঠা সেই হাতে এক কোঁটা মাংস নেই, তেঁতুলের শুকনো খোলার মত তার আদল।

'আমি। আপনি এখানে বসে কেন কাঁদছেন?' চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল।

'আমার আর মাথা গোঁজার জায়গা নেই বাবা।' বৃদ্ধা মুখ তুললেন। ছোট্ট গোল মুখে অজস্র ভাঁজ। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। মাথার চুলে কদমছাঁট।

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'যেখানে থাকতাম সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়িওয়ালা এক বছর ভাড়া দিতে পারিনি। তার কোন দোষ নেই। দোষ আমার।'

'কেন?'

'আমি দিতে পারিনি।'

'আপনি কত বছর এখানে আছেন?'

'আমি ?' হঠাৎ কাঁপতে লাগলেন বৃদ্ধা, তিন কুম্ভ পার হয়ে গেল গোপাল, যমুনা তবু এখনও মাটি দিল না গো।'

বুকের ভেতর একটা কাঁপুনি চট করে শুরু হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল চিন্ময়ের। বৃদ্ধা তার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন যমুনার কৃত অন্যায়ের প্রতিবিধান তার দ্বারাই সম্ভব। সে মুখ ঘুরিয়ে যমুনা নদীর দিকে তাকাল। বৃদ্ধা বললেন, 'আমি তো কোন পাপ করিনি। তবে কেন এই শাস্তি। কেন ঠাকুর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

চিন্ময় বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাল। অজস্র ভাঁজ, যার কয়েকটি বেশ গভীর। মুখখানি ছোট, চোখের মণির ওপর যে ঘোলাটে পর্দা তা হয়তো ছানি। চিন্ময় ধীরে ধীরে বৃদ্ধার পাশে গিয়ে বসল, 'তিন কুম্ভ মানে ছত্রিশ বছর ?'

'ছত্রিশ ? তা হবে। প্রথম প্রথম বছরের হিসেব করতাম' তাও যখন গুলিয়ে গেল তখন কুম্ভমেলার কথা মনে রাখি বাবা।'

'তখন আপনার বয়স কত ছিল ?

'মনে নেই। আমি সেসব কিছুই মনে রাখতে চাই না।' ডুকরে উঠলেন বৃদ্ধা।

'আপনি কি স্বেচ্ছায় সংসার ছেড়ে এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ বাবা। ঠাকুরের কাছে চলে এসেছিলাম শান্তি পাব বলে।'

'পেয়েছেন ?'

'পেয়েছিলাম। শুধু ঠাকুর যদি আমাকে বাঁচিয়ে না রাখতেন তা হলে—!' আবার কান্না।

'তার মানে আপনি এখানে শান্তিতে নেই ?'

'শান্তি !' বৃদ্ধার গলা জড়িয়ে গেল।

'এখানে আপনি একা থাকতেন ?'

বৃদ্ধা কথা বলতে পারলেন না। মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বললেন।

'এভাবে এখানে কষ্ট করে পড়ে না থেকে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ?'

'দেশ ?' বৃদ্ধা মুখ তুলে যমুনার দিকে তাকালেন, 'তিন কুম্ভ সময় বড় কম নয় না, কে আছে কে নেই জানিই না। আমি যে আছি তাই কেউ জানে না।'

'কোন যোগাযোগ নেই ?'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন। চিন্ময় চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বৃদ্ধার গলার স্বরটি বড় মোলায়েম। এত কান্না সেই স্বর ঢেকে ফেলেছে তবু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। এই সময় সনাতন ওপর থেকে ডাকল, 'বাবু, এবার উঠুন। সময় হয়ে গেল।'

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা বলে উঠলেন, 'সবার সময় হয় আমার কেন হয় না!'

চিন্ময় ঠোঁট কামড়াল। একটু ভেবে বলল, 'কি খেয়েছেন আজ ?'

'কিছু না। প্রসাদ নিতেও যাইনি।'

'গতকাল কিছু খেয়েছিলেন ?'

বৃদ্ধা মাথা নেড়ে না বললেন। চিন্ময়, বলল, 'কিনে খাওয়ার পয়সা না থাকলে প্রসাদ চেয়ে খেতে পারতেন। এতদিন নিশ্চয়ই তাই করেছেন।'

'আমি আর খাবো না।'

'খাবেন না ?' চিন্ময় অবাক হয়ে গেল।

'না খেলে দেখি গোপাল কি করে আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।' বৃদ্ধা কাঁপতে লাগলেন।

'আপনি আত্মহত্যা করবেন ? আত্মহত্যা মহাপাপ না ?'

'পুণ্য করে তো কিছু হল না বাবা, মরার জন্যে না হয় পাপ করি।'

চিন্ময়ের মাথার ভেতর কেমন হয়ে গেল। এই রকম সংলাপ সে কখনও শোনেনি। মুখ তুলে সে সনাতনকে দেখল। একটু ভাবল। তারপর হাত নেড়ে কাছে ডাকল। সনাতন কাছে এগিয়ে এলে সে পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বলল, 'ভাল সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে এসো তো। খুব তাড়াতাড়ি।'

টাকা নিয়ে সনাতন ছুটল দোকানে।

'আমি কিছু খাবো না।' বৃদ্ধা জেদের গলায় বললেন।

'কেন ?'

'আমি যা করতে চাই তাতে বাধা পড়বে।'

'বেশ। এটা কিন্তু ঠিক কাজ হবে না।'

'কেন ?'

'প্রথমেই আমাকে গোপাল বলে ডাকা হয়নি ?'

বৃদ্ধা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। চিন্ময় হাসল, 'হয়েছিল তো ?'

'হ্যাঁ গো। তুমি ছেলে, তুমি তো গোপালই।'

'তা হলে গোপালের কথা ফেলছেন কেন ?'

'হুঁ! অত মিষ্টি কথা বলো না। আমি ভুলছি না।'

'মিষ্টি কথা ?'

'ঠিকই তো। এক মুহূর্তের জন্যে উনি এসেছেন ভাব করতে। আমার কাজ পণ্ড করে চলে যাবেন চিরদিনের মত। এমন গোপালের কথা শুনতে আমার বয়ে গিয়েছে।'

চিন্ময় হাসল, 'কি করবেন বলুন। ওই তো যমুনা নদী। এক হাঁটু জল নেই যে কালীয় সাপের বদলে আপনি ওখানে গিয়ে শোবেন। বৃন্দাবনের মন্দিরগুলোতে আমি ঢুকিনি। আপনি তো এত বছর ধরে ঢুকেছেন। গোপাল যদি সেখানে শান্তির ব্যবস্থা করত তা হলে আপনি আত্মহত্যার কথা ভাবতেন না। আর যা ধুলো উড়ছে এখন, আমার মনে হয় তার দাপটে আপনার গোপাল হয়তো মথুরা, নয় দ্বারকায় চলে গিয়েছেন। অতএব আমার কথা শুনলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

সনাতন মিষ্টি নিয়ে এল। রসগোল্লাই পেয়েছে। ভাঁড়টা বৃদ্ধার পাশে রেখে চিন্ময় বলল, 'চলি'। সে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। রিক্সায় বসে বৃদ্ধার দিকে তাকাল একবার। তিনি সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছেন। পাশে রাখা মিষ্টির ভাঁড়ের দিকে তাকাচ্ছেনই না। সরু গলি, ভিড়, কীর্তনের দলকে কাটিয়ে খুব জোরে রিক্সা ছোটাতে পারছিল না সনাতন। শেষ পর্যন্ত ওরা মন্দিরগুলোর সামনে পৌঁছে গেল। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বৃদ্ধা মহিলাকে তুমি চেন সনাতন ?'

'না বাবু। এরকম কত বুড়ি আছে বৃন্দাবনে যাদের তিনকুলে কেউ নেই।'

'এঁরা আত্মহত্যা করেন?'

'হ্যাঁ বাবু। প্রতি মাসেই একজন না একজন হয় কাপড় গলায় বেঁধে, নয় বিষ খেয়ে মরে। রোগে ভুগেও যায় কেউ কেউ।' রিক্সা চালাতে চালাতে কথাগুলো বলল সনাতন।

চিন্ময় আর একবার কাঁপল। শেষ দেখার সময় বৃদ্ধা যে ভঙ্গিতে বসেছিলেন তাতে কি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে যে বদ্ধপরিকর বলেই এখন মনে হচ্ছে। জেনেশুনে একটি মানুষকে সে কিভাবে আত্মহত্যা করতে দিতে পারে? তাছাড়া বৃদ্ধার গলার স্বর আর যেভাবে তিনি তাকে গোপাল বলে ডেকে উঠেছিলেন, তা ভুলতে পারছিল না চিন্ময়। আজ এই বয়স পর্যন্ত সে অনেক ডাক শুনেছে। একা এই পৃথিবীতে খ্যাতি এবং পয়সা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সঙ্গ পেতে অসুবিধে হয়নি। সেই দূরত্ব-রাখা সম্পর্কের কেউ তাকে এমন আন্তরিক গলায় কখনও ডাকেনি। সেই মুহূর্তের ডাকটি যদি সত্যি হয়, যদি সেই ডাক শুনে তার বুকে আলোড়ন উঠে থাকে, তা হলে তারও একটা কর্তব্য থেকে যাচ্ছে।

বাসস্ট্যাণ্ডে রিক্সা থেকে নেমে সে সনাতনকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে গেল। বাস হর্ন দিচ্ছে। যাত্রীরা সবাই ফিরে এসেছে। মথুরা দর্শন করে তাঁরা যাবেন শাজাহানের প্রেমের প্রতীক দেখতে। কণ্ডাক্টর এখন মাথা গুনছে। চিন্ময় তাকে ডাকল, 'এই যে ভাই আমার স্যুটকেসটা নামিয়ে দাও। আমি আর আগ্রায় যাবে না।'

'যাবেন না? সে কি? পুরো টাকা দিয়ে দিয়েছেন, না গেলে তো রিফাণ্ড পাবেন না।'

'আমি রিফাণ্ড চাইনি, স্যুটকেস চেয়েছি।'

'আপনি এখানেই থেকে যাবেন?'

'না। আমার দেরি হবে। আপনাদের সবাইকে আটকে রেখে কোন লাভ নেই। আর আমার একার জন্যে সবাই কেন আটকে থাকবেন?'

কণ্ডাক্টরের কথায় খালাসি বাসের পেটের ভেতর থেকে চিন্ময়ের স্যুটকেস বের করে আনল। চিন্ময় সেটা নিয়ে সনাতনের রিক্সায় ফিরে গেল, 'চিন্তা নেই তোমার, যা ভাড়া চাইবে দেব, তুমি আবার আমাকে সেই যমুনার ধারে ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

সনাতনের এমন অভিজ্ঞতা যে আগে হয়নি তা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। সে কোন কথা না বলে প্যাডেলে চাপ দিল। রিক্সা চলতে শুরু করলে চিন্ময় নিজেই অবাক হল। বন্ধুরা বলেন সে মোটেই ভাব-প্রবণ নয়। এক বান্ধবী বলেছিল চিন্ময় যা করে ক্যালকুলেশন থাকে তাতে। ওরা এখন থাকলে কি বলত। নিজের এমন আচরণের কোন যুক্তি সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এটা ঠিক ওই বৃদ্ধা তাকে খুব টানছেন!

বেলা পড়ে আসছে। ভিড় বাঁচিয়ে সরু গলি দিয়ে যেতে সনাতন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আজ রাত্রে এখানে থেকে যাবেন বাবু?'

'থাকার জন্যে ভাল হোটেল আছে?'

'আছে দু-তিনটে। তবে আগ্রার বাস পেয়ে যেতে পারেন।'

'দেখি।' চিন্ময়ের আর আগ্রায় যেতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না।

যমুনার ধারে পৌঁছে ঘাটের দিকে তাকিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বৃদ্ধা নেই। দুটি শিশু ঘাটের সিঁড়িতে বসে সেই রসগোল্লা সবে সাবাড় করেছে বোঝা গেল। একজনের হাতে তখনও ভাঁড়খানা রয়েছে। ব্যস্ত হয়ে চিন্ময় সনাতনকে বলল, 'দ্যাখো তো, সেই বৃদ্ধা কোথায় গেল?'

সনাতন নেমে গেল শিশুদের কাছে। কথা বলল। ফিরে এসে জানাল ওরা জানে না। ঘুরতে ঘুরতে এই ঘাটে এসে ওরা একটু আগে ভাঁড়টা পেয়ে যায়। ওতে মিষ্টি আছে দেখে খেতে শুরু করে। চিন্ময় নিজের ওপরই রেগে গেল, 'সনাতন, দোষ আমার। কিন্তু তুমি যেমন করে হোক সেই বৃদ্ধাকে খুঁজে বের কর।

'আমি কোথায় খুঁজব বাবু। এখানে তো ওরকম দেখতে অনেকে আছে।'

'আমার মনে হয় উনি আর লোকালয়ে ফিরে যাবেন না। কাছে

পিঠে কোথাও আছেন কিনা কে জানে। তুমি ওদিকটায় যাও, আমি এদিকটা দেখি।'

সনাতন চারপাশে তাকাল। শেষ পর্যন্ত নদীর বুকে। হঠাৎ যেন কিছু দেখতে পেয়ে সে বলল, 'বাবু, দেখুন তো, ওই কাশ বনের মধ্যে কেউ যায় কিনা?'

প্রায় বিন্দু হয়ে আসা একটি মানুষের চলা নজরে এল চিন্ময়ের। এত দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু মানুষটি যে নারী তাতে সন্দেহ নেই। চিন্ময় মাথা নাড়ল, 'আমি ওখানে যেতে চাই সনাতন। তুমি এখানে আমার স্যুটকেসটা নিয়ে অপেক্ষা করবে?'

'তা করব। কিন্তু বাবু ওই চরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'কেন?'

'কেউ যায় না। সাপটাপ আছে।'

'বাঃ, বাড়ি ঘর তো আছে ওদিকে।'

'আছে কিন্তু কাশের জঙ্গলে নেই।'

'তবু দেখে আসি আমি।' চিন্ময় জুতো খুলে রিক্সায় সেগুলো রেখে সিঁড়ি ভেঙে জলে নামল। নোংরা জলে ব্যাঙাচিগুলো ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে: সাধারণ অবস্থায় সে কিছুতেই এই জলে পা দিত না। যদিও জল ঠাণ্ডা এবং পায়ের তলার বালির স্পর্শ বড় মোলায়েম। নদী পেরিয়ে বালির চরে সে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। এবার একটু থমকালো চিন্ময়। পথ নেই। মাটিতে বুনো লতার ছড়াছড়ি। সে আঙুলের ডগায় ভর করে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল। এবং তখনই তার নজরে এল বৃদ্ধাকে। না, একটুও ভুল হয়নি। কাশগাছের পাশে বালিতে তিনি শুয়ে আছেন। সে দ্রুত পা ফেলতেই মনে হয় একটা লম্বা প্রাণী সরসর করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। বৃদ্ধার কাছে পৌঁছে সে নিশ্বাস নিল কয়েক মুহূর্ত। বৃদ্ধার চোখ বন্ধ। চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। চিবুক এবং গালে এখনও অতীতের ফরসা চামড়া। নিজের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। সে ঝুঁকে পড়ল। বৃদ্ধা চোখ খুললেন না।

চিন্ময় ডাকল, 'মা।'

এবার চোখ খুলে গেল। সেই চোখে যেন পৃথিবীর শেষ বিস্ময়।

চিন্ময় বলল, 'আমি আপনার গোপাল। উঠুন। এইখানে শুয়ে থাকবেন না।'

'আমি যে মরে যেতে চাই।'

'সত্যি চান?' চিন্ময় খুব আন্তরিক গলায় বলল।

'হ্যাঁ গোপাল।'

'এই জায়গায় এলেন কেন?

'এটা বৃন্দাবন নয়।' এখানে পাপী কালীয় মরেছিল, তাই'

'আপনাকে যদি অন্য একটা জায়গা বেছে দিই, যাবেন?'

'অন্য জায়গা?'

'হ্যাঁ।'

'কেন গোপাল?'

'আমি চাই আপনি আমার সামনে মারা যান।'

'কেন?'

'কিভাবে?'

'সেটা এখনই বলতে পারব না। ভেবে দেখি। কিন্তু আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখান থেকে অনেক দূরে।' চিন্ময় বৃদ্ধার হাত ধরল। শীর্ণ শিরওঠা হাত।

'অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ। চিন্ময় বলল, 'আপনি তো বৃন্দাবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এই এতগুলো বছর ওখানে কাটিয়েও শান্তিতে মরতে পারলেন না. আপনার তো অন্য কোন জায়গায় যেতে অসুবিধে হবার কথা নয়।'

'না। তুমি যখন বলছ গোপাল, কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কেন?'

'সেখানে আর কে কে থাকে?'

'এই প্রশ্ন কেন?'

'আমি আর সংসারী মানুষের মধ্যে থাকতে পারব না।'

'থাকতে হবে না। আপনি আপনার গোপালের কাছে থাকবেন।'

যদি তাকে দেখতে ইচ্ছে না হয়, কথা বলতে মন না চায় বলবেন না, দেখবেন না।' চিন্ময় হাসল, 'আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকবে না'।

'আমি সেখানে শান্তিতে মরব।'

'চেষ্টা করব। আর শান্তি যদি না পান তাহলেও কোনও পার্থক্য হচ্ছে না। যদি চান আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'তুমি কোথায় থাকো গোপাল?'

'মা, আমি কলকাতায় থাকি।'

'না!' কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধা।

'কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনি যে আমার কাছে আছেন তাও কেউ জানবে না। আপনি আপনার মত থাকবেন। যেভাবে এখানে ছিলেন। দেখুন, শান্তি পান কিনা!'

এই ঘটনার বারো ঘন্টা পরে কলকাতাগামী একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে চিন্ময় চুপচাপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। বৃদ্ধা দুই বাথের এই কুপের নিচেরটায় কুঁকড়ে শুয়েছিলেন। তাঁর ছেঁড়া ময়লা থান, ফাটা পা, কোঁচকানো চামড়া আর জীর্ণ পুঁলি দেখে প্রথম শ্রেণীর এই কামরায় কণ্ডাক্টর প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। চিন্ময় তাকে টিকিট দেখিয়েছিল। টিকিটে যাত্রী হিসেবে বৃদ্ধার নাম লেখা ছিল 'জননী দেবী'। এ ছাড়া চিন্ময়ের কিছুই করার ছিল না। বারংবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও বৃদ্ধা নিজের নাম বলেননি। অবাঙালি কণ্ডাক্টর ইংরেজিতে লেখা জননী শব্দটির অর্থ আলাদা করে বুঝতে চায়নি। সে শুধু বলেছিল বৃদ্ধা যেন অন্য যাত্রীদের বিরক্ত উৎপাদন না করেন। চিন্ময় সেই দায়িত্ব নিয়েছিল।

এই বারো ঘন্টা বৃদ্ধা চারটি মিষ্টি এবং জল ছাড়া কিছুই খাননি। জেগে থাকার সময়ে মাঝেমাঝেই তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছে।

চিন্ময় চুপচাপ দেখেছে, কিছু বলেনি। এখন খোলা প্রান্তরের দিকে সে কৃতকর্মটির বিশ্লেষণ করছিল। এই কাণ্ডটি কেন সে করল? শুধু বৃদ্ধার প্রতি করুণায়? নাকি 'গোপাল' ডাকটি শুনে তার হৃদয় এমন আর্দ্র হয়ে গিয়েছিল যে সে আবেগের শিকার হয়েছিল? পরিচিত-জনেরাও এই কাজের কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারবে না। তাহলে কেন সে এই বৃদ্ধাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে?

চিন্ময় অনেক ভেবেছে। যে কারণটা একটু একটু করে মাথা তুলছিল সেটির মুখোমুখি হতে চাইছিল না সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সব কিছুকে আড়াল করে রইল। একটি মানুষ পৃথিবীর সব সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ঈশ্বরে আত্মনিবেদন করেছিলেন। দীর্ঘকাল ঈশ্বরে বাস করেও যাঁর ঈশ্বরলাভ হল না তাঁর সমস্ত জগত এবং জগতপতি সম্পর্কে মোহমুক্তি হল। তিনি এই শরীরের বিলোপ চাইলেন। এই মুহূর্তে তাঁর বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার কোন ফারাক নেই। একেই কি বলে মুক্তমানুষ? চিন্ময় জানে না। কিন্তু সেই কবে জনক-জননীকে হারিয়ে, মানুষের দেওয়া আঘাত সহ্য করতে করতে নিজেকে শামুকের মত খোলস পরিয়েও সে যে সৃষ্টি করে যাচ্ছিল এতদিন তাতে সব ছিল। কিন্তু কিছু একটা ছিল না। একজন লেখককে নাকি আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত হতে হয়। সেই নির্লিপ্ত অর্জন করতে পারেন যাঁরা তাঁরাই প্রকৃত স্রষ্টা। বৃদ্ধার কাছে যখন যমুনার চর, বৃন্দাবন অথবা অন্য কোন জায়গার মধ্যে কোন ফারাক নেই তখন তিনি তার চোখের সামনে কলকাতায় ফ্লাটে থাকতে পারেন। সে দেখতে চায় এই বৃদ্ধার কোন পরিবর্তন হয় কিনা। তাহলে কি সে একটি অসহায় মহিলার জীবন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে যাচ্ছে। আর একটি উপন্যাসের রসদ? আর একটি উপন্যাস যা তাকে কিছু টাকা দেবে? এটাই তো শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে যাবে। নাকি সে একটি স্নেহের উৎসকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে এই কারণে যখনই প্রয়োজন হবে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে 'গোপাল' ডাকটি শুনে স্নিগ্ধ হবে। তার মানে নিজের চাওয়াকে পূর্ণ করতে সে বৃদ্ধাকে ব্যবহার করতে চলেছে। এমন চিন্তা চিন্ময়ের

মোটেই ভাল লাগছিল না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল বৃদ্ধার সঙ্গ পাওয়ার পর সে আর সিগারেট খায়নি। পকেট থেকে প্যাকেট বের করেও সে মত পাল্টালো। এটাও তো সিগারেট না খাওয়ার একটা সুন্দর অজুহাত হতে পারে। অন্তত স্বাস্থ্যটা উপকৃত হোক।

ট্রেন লেট ছিল। হাওড়ায় পৌঁছাতে ভাল রাত হয়ে গেল। বেশ কয়েকবার ডাকার পর বৃদ্ধা চোখ মেললেন। চিন্ময় বলল, 'মা। শরীর কেমন লাগছে।'

বৃদ্ধা কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কোথায় আছেন তা জানার আগ্রহ একবারও প্রকাশ করেননি। চিন্ময় আবার জিজ্ঞাসা করল— 'আপনি কি হাঁটতে পারবেন? আমাদের অনেকটা দূরে হেঁটে যেতে হবে। আগে থেকে জানাতে পারিনি তাই গাড়ি আসবে না।'

বৃদ্ধা চুপ করেই রইলেন। ট্রেন থামল। হুড়মুড়িয়ে যাত্রী-কুলির যাতায়াত চলল। অপেক্ষা করল চিন্ময়। তারপর একটি কুলির মাথায় স্যুটকেস চাপিয়ে বলল, 'ট্যাক্সির লাইন হবে, আমাকে একটা প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও।'

কুলি বৃদ্ধার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। তারপর বলল, 'ইয়ে বুড্ডি আপকো সাথ হ্যায়?'

'হ্যাঁ। ইনি হাঁটতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'তব আপলোগ ইয়হা খাড়া রহিয়ে। হাম গাড়িওয়ালাকো ইঁহা লিয়াতা হ্যায়। লেকিন জাদা জাস্তি ভাড়া লাগেগা।' কুলি বলল।

'ঠিক আছে। তাতে কোন অসুবিধে নেই।'

অন্য সময় চিন্ময় এত বেশি টাকা খরচ করত না। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের ভেতরে গাড়ি আনিয়ে তাতে বৃদ্ধাকে তুলে যে স্বস্তি হল তার তুলনায় টাকাটা বেশি মনে হল না তার। রাতের হাওড়া থেকে কলকাতায় ঢুকে সে রেলকোম্পানিকে ধন্যবাদ দিল। অন্ধকার অনেক কিছু আড়াল করে রাখে। দিনের আলোয় এই বৃদ্ধার চেহারা আর পোশাক পথচারীদের কৌতূহলী করত। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর মানুষগুলোও চমকে যেত। মুখে মুখে এই খবর টালা টু টালিগঞ্জ ছড়িয়ে পড়লে

অবাক হবার কিছু ছিল না। এখন ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় খুব কম লোকের চোখে পড়বেন বৃদ্ধা।

বাড়ির একেবারে সামনে পৌঁছে ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে সে বৃদ্ধাকে নামতে বলল। বৃদ্ধার অবস্থা খুবই কাহিল, তবু তিনি নামলেন পুঁটুলি আঁকড়ে ধরে। দারোয়ান খইনি খাচ্ছিল, চিন্ময়কে চিনতে পেরে সেলাম করল। আর তারপরেই তার চোখ বিস্ফারিত। চিন্ময় কোন কথা না বলে স্যুটকেশ এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে বৃদ্ধাকে ধরে লিফটের দিকে নিয়ে গেল। এখন মানুষজন বাইরে নেই। লিফট নেমে আসতেই মিসেস মুখার্জি তাঁর মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন, 'আরে চিন্ময়বাবু, আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?'

'আসতে হল।'

মিসেস মুখার্জির নজর তখন বৃদ্ধার ওপরে. 'হু ইজ শী?'

'মিসেস জননী দেবী'। জবাবটা দিয়ে বৃদ্ধাকে নিয়ে সে লিফটে উঠে দরজা বন্ধ করল বোতাম টিপে। লিফ্‌ট যখন ওপরে উঠছে তখন বৃদ্ধা এমন ভয় পেয়ে গেলেন যে তাঁকে জড়িয়ে ধরেও চিন্ময় কাঁপুনি থামাতে পারছিল না। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে সে স্বস্তি পেল। ওপাশের দুটো ফ্ল্যাটের দরজাই বন্ধ। নিজের ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপল সে। তার আজ আসার কথা নয়। সুতরাং ধরণীদা একটু ঘুরতে যেতে পারেই। দ্বিতীয়বার বেল টিপতেই ধরণী দরজা খুলে চিৎকার করে উঠল, 'একি! দাদাবাবু. আপনি চলে এলেন?' আর পরেই যেন ভূত দেখেছে এমন ভঙ্গিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইল।

চিন্ময় ধমকালো, 'হাঁ করে দেখছ কি? পথ ছাড়ো।'

ধরণীদা সরে দাঁড়াতে চিন্ময় বৃদ্ধাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ [illegible]ল। ধরণীদা তখনও হতভম্ব। চিন্ময় তাকে বলল, 'পাঁচ মিনিট [illegible]য় দিলাম। ওপাশের ছোট ঘরটাকে পরিস্কার করে দাও। ইনি [illegible]খানেই থাকবেন।'

ধরণীদা ঘাড় দোলালো, 'পরিস্কারই আছে।'

চিন্ময় সোজা সেই ঘরের দরজায় চলে গেল। ড্রইং রুম থেকে

ডাইনিং স্পেস হয়ে ছোট ঘরের দরজায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়াল। জুতো খুলে ঘরে ঢুকল সে। একটা ছোট খাট, আলমারি ছাড়া আর কিছুই নেই। পাশের বাথরুমেও কোন বাড়তি কিছু নেই। সে বৃদ্ধাকে সেই ঘরে নিয়ে এল, 'এখানে আপনি থাকবেন। এখন থেকে এটাই আপনার ঘর। এপাশে বাথরুম। ওই কোণে একটা অ্যান্টিরুম, মানে আর একটা ঘর আছে যেখানে আপনি রান্না করতে পারবেন। ধরণীদা আপনার রান্না ভাল ভাবে করে দিতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় তাতে আপনার মন ভরবে না। আজ রাত্রে সম্ভব হবে না, কাল থেকে ওই ব্যবস্থা হবে। আপনি না চাইলে কেউ এই ঘরে ঢুকবে না। আপনাকে একটা বেল দিয়ে যাবো, যদি কিছু প্রয়োজন হয় ওটা টিপলেই কেউ না কেউ এসে যাব।'

চিন্ময় চুপ করল। বৃদ্ধা অবাক হয়ে ঘর দেখছিলেন। কয়েক সেকেণ্ড বাদে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ঘরে আমি থাকব?'

'হ্যাঁ। আমি এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, আপনি হাওয়া পাবেন, আকাশ দেখতে পারবেন। ফ্যান আছে। ওখানে সুইচ। বেশি গরম লাগলে ফ্যান চালাবেন। যদি ইচ্ছে হয় চালাবেন না। যা ইচ্ছে হয় করবেন। ধরণীদা রোজ সকালে আপনার বাজার এনে দেবে।' কথাগুলো বলে চিন্ময় দরজা টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ধরণীদাকে দেখতে পেল। সে বসার ঘরে সোফায় বসে ধরণীদাকে ডাকল, 'শোন, এই মহিলা এখন থেকে এখানে থাকবেন। ওঁর কোনো অসম্মান আমি সহ্য করব না।'

'আশ্চর্য! অসম্মান করতে যাব কেন?' ধরণীদা বলল, 'কিন্তু ইনি কে?'

'জননী দেবী।'

'মানে?'

'তুমি বুঝবে না। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। চিন্ময় সিগারেট ধরাল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একটা চমৎকার আরাম শরীরে এল। তিনটে টান দিয়ে সে বলল, 'এখন তোমাকে বাইরে যেতে হবে।

প্রথমে ছ্যাখো গোটা চারেক ভাল থান পাও কিনা। নিয়ে নেবে। সেই সঙ্গে চারটে সেমিজ। বাকিটা কাল দেখা যাবে।'

'এত রাত্রে দোকান খোলা পাব কি করে?'

'ওঃ। চেষ্টা করো না। গড়িয়াহাটে তো ফুটপাতের দোকান মাঝরাত পর্যন্ত খোলা থাকে। ছুটো অন্তত আনো। বাড়িতে মিষ্টি ফল থাকলে ওঁকে দেবে। যাও।'

সকালে ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়ে এককাপ চা খাওয়া তার অনেকদিনের অভ্যেস। সেটা খাওয়া আর খবরের কাগজ পড়া এক-সঙ্গে চলতে থাকে। যেদিন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে না, যেদিন হেড লাইন থাকে, চালের দাম বাড়ল অথবা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সরকারী কর্ম-চারীদের সময়মত অফিসে আসা উচিত, সেদিনের খবরের কাগজটি যদি তিন বছর পর ওইরকম সাধারণ দিনে হুবহু ছেপে দেওয়া যায় তাহলে ক'জন পাঠক বুঝতে পারবে এই নিয়ে একটা কুইজ করার ভাবনা প্রায়ই মাথায় আসে ওর। এসব চুকে গেলে বাথরুমে যাওয়া, দাড়ি কামানো এবং স্নান সারার পালা। তারপর লিখতে বসা। সাততলার ফ্ল্যাটে জানলার ধারের টেবিলে বসে লিখতে লিখতে পাখিদের দেখা। বড় বড় পাখি।

আজ স্নানের ঘরেই মনে পড়ল একবার দেখা করতে যাওয়া উচিত। কাল নতুন জায়গায় বৃদ্ধার ঘুম হল কিনা সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। জেদের বশে একটা কাণ্ড যখন সে করেই ফেলেছে তখন তার শেষ দেখে তবে ছাড়বে। পোশাক বদল করে ডাইনিং টেবিলের কাছে আসতেই ধরণীদার দেখা পেল। ব্রেক ফাস্টের আয়োজন করছে। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'উনি উঠেছেন?'

ধরণীদা মাথা নাড়ল, জানে না।

'কি কব? বাড়িতে একজন মানুষ এল?'

'বাঃ। বেল না বাজলে ঢোকা নিষেধ হয়েছে তো।'

চিন্ময় থমকে গেল। নিষেধটা সে-ই করেছে। কথা না বাড়িয়ে বৃদ্ধার ঘরের দরজায় শব্দ করল সে। তারপর হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে

পা দিল। বৃদ্ধা বসে আছেন খাটের ওপর বাবু হয়ে জানলার দিকে মুখ করে। ধরণীদার আনা কোরা থান আর সাদা সেমিজ বড্ড বেশি ফটফটে লাগছে ওঁর শরীরে ছোট্ট পুতুলের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। পাশে গিয়ে চিন্ময় বলল, 'মা, আপনার শরীর কেমন আছে?'

বৃদ্ধা মুখ ফেরালেন, চিন্ময়কে দেখলেন, তারপর আবার জানালার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কি অনেক উঁচুতে আছি?'

'হ্যাঁ মা, সাত তলায়।'

'সাত! আকাশটা যেন কত কাছে।'

'মা, বলুন আপনার কি কি লাগবে?'

'কিছু না!'

'আপনি সকালে চা খাবেন তো?'

'না গোপাল।'

'আচ্ছা, জলখাবার কি দেবে ধরণীদা? আমার এখানে যে কাজ করে তার নাম ধরণীদা। খুব ভাল মানুষ।'

'আমি তো জলখাবার খাই না। খাওয়ার অভ্যেসই নেই দিনে রাতে আমি একবেলা খাই। ভাত আর আলু সেদ্ধ। নিজেই রাঁধি।

'বৃন্দাবনে যা খেতেন এখানেও তাই খাবেন?'

'আমার শরীর তো আর এখন তখন বুঝবে না বাবা!'

'বেশ। আপনার যা খুশি তাই করবেন। এখানে আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না। কাল রাত্রে ভাল কাপড়জামা পায়নি ধরণীদা. আজ এনে দেবে!'

হাত নাড়লেন বৃদ্ধা, 'না, না। এতো খুব ভাল। নতুন বলে স্বস্তি হচ্ছে না, তবে এটাও ঠিক, কত বছর পরে নতুন জামা নতুন কাপড় গায়ে দিলাম। তিন বছর আগে একজন লোক এসেছিল, তার ম মরে গিয়েছে, সেই মায়ের নামে আমাদের ধুতি দিয়ে গিয়েছিল। না না, আর আমার জন্যে কিছু আনতে হবে না গোপাল।

'আপনি স্টোভ জ্বালতে পারেন। মানে রান্নার জন্যে?'

'স্টোভ? কেন, উনুন নেই?'

'না মা। এখানে উনুন ধরানো নিষেধ।'

'তাহলে সেই লোককে পাঠিয়ে দাও, তার সঙ্গে কথা বলে নেব?'

স্বস্তি পেল চিন্ময়, 'বেশ, পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দরজা বন্ধ করে ধরণীদাকে খবরটা দিয়ে লেখার টেবিলে ফিরে এল চিন্ময়। কলম খুলে কাগজ নিয়ে বসলে প্রথম একটু সময় লাগে, তারপর ভাবনাচিন্তা ছাড়াই লেখা শুরু করে দেয়। চরিত্র এবং ঘটনা আপনা-আপনি চলে আসে কলমে। তখন তার কাজ শক্ত হাতে হাল ধরে রাখা, যাতে ওরা দাঁড় বায়। আজ পনের মিনিটেও একটা শব্দ বের হল না। পেছনে শব্দ হতেই দেখল ধরণীদা দাঁড়িয়ে আছে। তার লেখার সময় ডাকাডাকি নিষেধ। বাইরের লোক কিংবা টেলিফোন এলেও না। আজ ধরণীদা বলল, 'বড্ড বিপদে পড়েছি।'

'কেন?'

'একবার নিচে যেতে হবে এখনই।'

'কেন?'

'দারোয়ানের কাছে। ছাই আনতে।'

'ছাই? কি হবে?

'উনি দাঁত মাজবেন। এতদিন ছাই ছাড়া অন্য কিছুতে দাঁত মাজেননি।'

'দারোয়ানের কাছে পাবে?'

'না পেলে এপাড়ায় কারো কাছে পাব না। যাদবপুরে যেতে হবে।'

হেসে ফেলল চিন্ময়, 'আর কি কথা হল?'

'একবেলা আলুসেদ্ধ আর ভাত উনি খাবেন। আমাকে ঘরে গিয়ে স্টোভ ধরিয়ে আর নিভিয়ে দিতে হবে। আর একটা কথা উনি বলেননি কিন্তু আমি বলতে চুপ করে গেলেন। সেটাও আনতে হবে।'

'কি জিনিস?'

'একটা ছোট কাঠের চৌকি কিনে আনতে হবে নতুন।'

'তাতে কি হবে?'

'ওঁর কাছে নাকি ঠাকুর আছে!'

চিন্ময়ের মনে ধাক্কা লাগল। তার ধারণা হয়েছিল বৃদ্ধা মানুষ এবং দেবতা সম্পর্কে মোহমুক্ত। সবকিছু ত্যাগ করেই তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। তা সঙ্গে ঠাকুর আছে মানে ছবি কিংবা মূর্তি আছে পুঁটুলিতে। এটা কিরকম হল।

লেখা হচ্ছিল না। ধরণীদা নেমে গিয়েছে নিচে। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বে সে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। গতরাত্রে মদ্যপান করা হয়নি। দিল্লিতে থাকতে কোন সন্ধে বাদ যায়নি। দিল্লির মানুষরা জানত যে আগ্রা থেকে ফেরার পথে ক'দিন থেকে যাবে। ওদের বঞ্চিত করতে হল। এখন চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া দরকার। ফেরার পথে সে মোটেই সময় পায়নি। কিন্তু চিঠি লিখতেও আলস্য লাগে! কাল রাত্রে সে মদ্যপান করেনি কেন? একা বসে মদ খেতে যদিও তার মোটেই ইচ্ছে করে না। কিন্তু ঠিক দু-পেগ যে গলায় ঢালে না এমন নয়। এই মদ্যপান না করা কি বৃদ্ধা বাড়িতে এসেছেন বলে? হয়তো তাই। কিন্তু যেটা সত্যি সেটা হল তার মনে কখনই ইচ্ছা আসেনি।

ব্রেকফাস্ট খাবার পর তার মন খারাপ হল। সকাল থেকে অনেক কিছু খাওয়া হয়ে গেল অথচ বৃদ্ধা না খেয়ে আছেন। ধরণীদার কাছ থেকে একটা প্লেটে মিষ্টি আর গ্লাসে দুধ নিয়ে সে জুতো খুলে বৃদ্ধার ঘরে ঢুকল। ঢুকতেই নজরে পড়ল ঘরের এক কোণে ধরণীদার সদ্য-কেনা চৌকির ওপরে একটা বড় পাথর শোওয়ানো আছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল, বুঝি শালগ্রামশিলা। কিন্তু ভাল করে নজর দিতেই ভুল ভাঙল। সাদামাটা পাথর। সে ডাকল, 'মা, আমার কথা রাখতে হবে। আপনি এগুলো খেয়ে দিন।'

বৃদ্ধা জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, মুখ ফিরিয়ে দেখলেন।

চিন্ময় বলল, 'আপনি না বললে আমারও খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

'দুধ খাবো না।'

'কেন? দুধ না খেলে শক্তি পাবেন কি করে?'

'শক্তির কি দরকার? যমুনার বুকে না মরে এখানে মরব এই তো কথা।'

'যতক্ষণ না মরেন ততক্ষণ খান।'

'দুধ খেলে শরীর খারাপ হবে।'

'তাহলে এই মিষ্টি আর ফল খান। ফল দিয়ে যাচ্ছি।'

'তুমি আমাকে এভাবে বলো না গোপাল, আমার লজ্জা লাগছে।'

'তা হোক। আমার কাছে যতদিন থাকবেন ততদিন নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া করুন।' মিষ্টির প্লেট টেবিলের ওপর রেখে চিন্ময় চৌকির দিকে তাকাল, 'উনি কোন ঠাকুর?'

'ঠাকুর কেন হবে? যমুনায় নেমে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'নিজের মাথায় মারব বলে, যদি তাতে প্রাণ যায়!'

'তাহলে ওই পাথর সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কেন?'

মাথা নাড়ালেন বৃদ্ধা, 'জানি না।'

'চৌকির ওপর রেখেছেন যে?'

'সব সময় নজরে পড়বে আর ভাবব কাজটা করতে পারিনি।'

বাইরে বেরিয়ে এল চিন্ময়। কথাগুলো শোনার পর থেকে শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়েছে। এরকম মানুষ জীবনে সে কখনও ছাখেনি। যেন নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যেই মনটা তৈরী করে নিয়েছে। এখন তার কিছুই করার নেই। লিখতেও ইচ্ছে করছে না। সে টেলিফোনের কাছে গেল। ঘড়ি দেখল। কাকে ফোন করা যায়। ঘনিষ্ঠদের সবাই জানে সে দিল্লীতে। রিসিভারে হাত দেবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। চটপট তুলে নিয়ে সে হ্যালো বলতে, ওপার থেকে একটা নারী কণ্ঠ নাম্বারটা আওড়ে গেল। চিন্ময় জানতে চাইল কে ওপারে?

কেমন আছ চিন্ময়?'

বেশ পরিষ্কার গলা। উচ্চারণ স্পষ্ট কিন্তু কেমন যেন।

'আপনি কে কথা বলছেন।'

'আমার গলা তুমি ভুলে গিয়েছ?'

'রাত্রি ?'

'যাক, চিনতে পারলে। এখন তোমার কত নাম,শুনেছি বড়লোক হয়েছ লিখে। শুনে আমার খুব ভাল লাগছে। অবশ্য এই তুমি যে সেই তুমি বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল। একবার ভেবেছিলাম খবরের কাগজের পার্শোনাল কলমে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানতে চাইব।'

'ভুল হয়েছিল বুঝতে ?'

'নিশ্চয়ই! তোমার কোন লেখায় যে আমি নেই, আমাদের সময় নেই।'

'আমাদের সময় ?'

উত্তর এল না কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞাসা এল, 'তুমি কি এখনও একা আছ ?'

'এতদিন ছিলাম। কাল একজন মহিলাকে এনেছি এখানে।'

'মহিলা ? তোমার কেউ হন ?'

'না। আগ্রায় যেতে বৃন্দাবনে আলাপ হয়েছিল। ভাল লাগল, নিয়ে এলাম।'

'বয়স কত ?'

'জিজ্ঞাসা করিনি।'

'চমৎকার! এটা কি নতুন খেলা ?'

'খেলা ?'

'তা নয়তো কি ? তোমার সঙ্গে যখন আমার সম্পর্ক ছিল তখন তুমি লেখক ছিলে না। আর লেখকদের তো নারীঘটিত ব্যাপারে দারুণ সুনাম। ব্যাপারটা জানলে আমি তোমার পাবলিশার্সের কাছে গিয়ে টেলিফোন নাম্বার নিতাম না।'

রিসিভার রেখে দিয়েছিল রাত্রি। কিন্তু ততক্ষণ চিন্ময়ের মাথায় অন্য ভাবনা এসে গিয়েছে। অনেকবার প্রশ্ন করেও বৃদ্ধার পারিবারিক কোন খবর সে পায়নি। যদি খবরের কাগজে এই ব্যাপার জানিয়ে একটা বিজ্ঞাপন দেয় তাহলে কাজ হবে ?

চিন্ময় কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল, 'প্রায় চল্লিশ বছর বৃন্দাবন-

বাসিনী এক বৃদ্ধার কোন আত্মীয়,' না হলনা। একটু ভেবে আবার লিখল, 'ছত্রিশ বছরের বেশি বৃন্দাবনে আছেন এমন এক বাঙালি বিধবার কোন আত্মীয় এই বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করুন। মহিলা খাটো, গায়ের রঙ ফর্সা। কারো সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না।'

নিজের মুসাবিদা নিজেরই পছন্দ হচ্ছিল না চিন্ময়ের। 'বৃন্দাবন-বাসিনী এক বাঙালি বৃদ্ধা বিধবা অবস্থায় ছত্রিশ বছর আগে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। গায়ের রঙ ফর্সা, ছোটখাটো শরীর। কারো যদি এমন আত্মীয়ার কথা স্মরণ আসে যোগাযোগ করুন।'

মনে হল এইটে অনেক স্পষ্ট হল। এখন তিন-চারটে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপনটা যাওয়া দরকার। অবশ্যই বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন। চিন্ময় অনাদি মণ্ডলকে টেলিফোন করল। ভদ্রলোক তো অবাক, 'এ কি ব্যাপার? আপনি কবে ফিরলেন?'

'গতকাল। শুনুন, একটা কলম আর কাগজ নিন। নিয়েছেন? লিখুন, চিন্ময় বয়ানটা ধীরে ধীরে বলে গেল, 'সবকটা বাংলা কাগজে একটু আলাদা করে বিজ্ঞাপনটা আগামী কাল এবং পরশু ছাপবেন। যা খরচ হবে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেবেন।'

'কি ব্যাপার বলুন তো? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।'

'এখন বুঝবেন না।'

'ওহো। নতুন উপন্যাসের জন্যে কিছু মশলা? না, এক পয়সা দিতে হবে না আপনাকে। আমি আমার পয়সায় ছেপে দিচ্ছি শুধু আপনি একটা কথা দিন—।'

'কি কথা?'

'উপন্যাসটা আমিই ছাপব।'

'যদি লিখি তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই দেব।' হেসে রিসিভার নামিয়ে রাখল চিন্ময়।

পূজোর এখনও দেরী আছে। সাধারণত পঁচিশে বৈশাখ থেকে লেখা শুরু করে সে। এখন একটা ধারাবাহিক চলছে দেশের সেরা সাপ্তাহিকে। এবছর পূজোয় তিনটের বেশি লিখবে না ঠিক করেছিল। ছুটো উপন্যাস

আর একটা বড় গল্প। কিন্তু আরও দুটো কাগজের সঙ্গে তার এতদিনের সম্পর্ক ফেলতে পারা যাচ্ছে না। উপন্যাস নয়, তাদের দুটো বড় গল্প দিতে হবে। এসব লেখার কোন পরিকল্পনাই মাথায় নেই। অনাদি মণ্ডল নিশ্চয়ই ভাবছে তার পুজোর উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন কিছু হবে কারণ সবাই তো জানে সে আবেগের মাথায় কোন কাজ করে না। কেন যে তার সুনাম বা দুর্নাম তা আজও রহস্যময়।

সিগারেট ধরাল চিন্ময়। এখন ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। স্নানের আগে দুটো বিয়ার খাওয়ার ইচ্ছে মাঝেমাঝেই হয়। ফ্রিজে বিয়ার আছে। ধরণীদাকে হুকুম দিয়ে বিয়ার আনাল সে। জননী দেবীর কাছে তার এখন যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অতএব আরাম করা যেতে পারে। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে তার চোখে একটি মেয়ের শরীর ভেসে উঠল। খুব সুন্দর বা আকর্ষণীয় শরীর নয়। বাংলাদেশের আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের আদল। গায়ের রঙ তার শ্যামলা। মুখখানা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। এই মেয়ে, ধরা যাক, কোন মতে বি এ পাশ করেছে। আচ্ছা, এমন যদি পরিস্থিতি হয়, মেয়েটিকে আগামীকাল সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে মেয়েটি কি করতে পারে, কোথায় যাবে? একটা চাকরি এবং থাকার জায়গা এক মুহূর্তে কলকাতায় চট করে পাওয়া অসম্ভব। ধরা যাক, মেয়েটিরও এক প্রেমিক ছিল সে বেকার, এখন মেয়েটিকে আশ্রয় দেবার সামর্থ্য নেই। এই মেয়ে কখনই আত্মহত্যা করবে না, আত্মমর্যাদা খোয়াবে না, মাথা তুলে বেঁচে থাকবে, কিন্তু কিভাবে? এমন মেয়েকে নিয়ে এবারের পুজোর উপন্যাস লিখলে কেমন হয়? এতটা ভেবে সে কখনও কোন লেখাই শুরু করেনি। খানিকটা নিয়মের ব্যতিক্রম হল বটে কিন্তু খারাপ লাগছে না। মুস্কিল হল মনে মনে মেয়েটির মুখ সে আঁকতে পারছে না। মুখ আঁকা না হলে চরিত্র তৈরী হবে না। এই সময় বাইরে থেকে কেউ বেল বাজাল।

দেড় বোতল বিয়ার হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে এখন সোওয়া বারো। এমন সময় কারো আসার কথা নয়। আর সবাই তো জানে সে

কলকাতায় নেই। ধরণীদার জন্যে অপেক্ষা না করে চিন্ময় নিজেই এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। ল্যাচ ঘুরিয়ে পাল্লা টানতেই সে অবাক হয়ে গেল। রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রির পরনে নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ। গাঢ় নীল নয়, শরতের আকাশী নীল। মাথার চুল কাঁধ-পর্যন্ত। এটা আগে ছিল না। স্বাস্থ্য ঈষৎ ভারি কিন্তু বেমানান নয়। মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ জমলেও লাবণ্য বেঁচে আছে।

'অবাক হচ্ছ?' রাত্রির গলার স্বর টেলিফোনের চেয়েও নরম।

'হ্যাঁ। এসো।'

দরজা টেনে দিয়ে সে রাত্রিকে ড্রইং রুমের সোফা দেখিয়ে দিল হাত বাড়িয়ে। সেখানে বসল না রাত্রি, দেওয়ালে ঝোলানো তপন ঘোষের আঁকা ছবিটুটো দেখল। ঘোড়া। খুব তেজী ভঙ্গি। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে দেখে তুমি কতখানি অবাক হচ্ছ?'

'অনেকটা।'

'কারণ?'

'তোমাকে আর কখনও দেখব আশা করিনি।

রাত্রি মাথা নাড়ল। তারপর মাথা কাত করে (এটা একসময় রাত্রির প্রিয়ভঙ্গি ছিল) জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমার কথা তোমার কখনও মনে পড়ত?'

'প্রথম প্রথম খুব পড়ত। তারপর যা হয়—।'

'আশ্চর্য।'

'না, আশ্চর্য বলার মত কিছু নয়। আমার মা যখন মারা গেলেন তখন অন্তত এক বছর তাঁকে ভুলতে পারিনি। এখন তো সারাদিনে একবারও মনে পড়ে না। যাক, কেমন আছ বল?' হাতের নিভে আসা সিগারেট টেবিলের ওপর রাখা সোনালি অ্যাসট্রেতে গুঁজে রাখল চিন্ময়।

'তার আগে জানতে পারি তুমি কি করছিলে?'

'বিয়ার খাচ্ছিলাম। খেয়ে স্নানে যেতাম।'

'বিয়ার? তুমি মদ খাও?'

'অল্প স্বল্প। ইচ্ছে হলে।'

'তাহলে তো রসভঙ্গ করলাম।'

'না। তোমার আপত্তি না থাকলে আমার সামনে বসতে পারো।'

'বেশ। তোমার মদ খাওয়া দেখি।'

'এসো ! ওঘরে যেতে হবে তোমাকে।' চিন্ময় পাশের ঘরে এগিয়ে গেল।

টেবিলের একপাশে বসে বিয়ারের গ্লাসটা টেনে নিল চিন্ময়। চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কথা শুনে মনে হল মদের ব্যাপারে তোমার আসক্তি নেই।'

'না নেই।' ঘরে ঢুকে চারপাশে নজর বুলিয়ে রাত্রি উল্টোদিকের চেয়ারে বসল, 'তোমার বান্ধবীকে দেখছি না ! তিনি কোথায় ?'

'ক্রমশ প্রকাশ্য। আগে তোমার খবর বল।' খুব সাধারণ গলায় জানতে চাইল চিন্ময়।

রাত্রি ওর মুখের দিকে তাকাল, 'চিন্ময় তুমি খুব পাল্টে গিয়েছ।' 'তাই ?' বিয়ারে চুমুক দিল সে, 'এটা কি আমার প্রশ্নের উত্তর ? যাই বল, তোমার ফোন পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। তুমি এখানে আসবে তাও ভাবিনি। কত বছর হল ? পনের ?'

'হ্যাঁ। আমার চেহারা কি খুব পাল্টেছে ?'

রসিকতা করি। শেষ যখন দেখেছিলাম তখন তুমি পঞ্চমীর বিকেল। এখন অবশ্যই অষ্টমীর দুপুর।' চিন্ময় হাসল।

'যাক। তবু যে বলে ফেলনি দশমীর সকাল এই আমার ভাগ্য।'

'পনের বছরে তোমাকে কিন্তু আমি একটুও বিরক্ত করিনি। আমার ছায়া তোমার জীবনে যাতে কোনভাবে না পড়ে এই কথা চেয়েছিলে। আশা করি স্বীকার করবে কথা রেখেছি।'

'চিন্ময়।'। রাত্রির গলা ধরে গেল।

চিন্ময় তাকাল না। এক চুমুকে গ্লাসের বিয়ার শেষ করল।

'চিন্ময়, আমি তোমার কাছে ক্ষমা পাব না ?'

'এখন এই সব কথা কেন ?'

'আমি, আমি এখন একা।'

'মানে বুঝলাম না।'

'ধীরেশ নেই।'

চিন্ময় চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। নতুন করে বিয়ার ঢালল গ্লাসে।

'কি হয়েছিল?'

'প্লেন ক্রাশ্। লস এঞ্জেলেস থেকে সানফ্রান্সিসকো আসতে।'

'তারপর?'

'অনেক লড়াই করেছি চিন্ময়। ও বেঁচে থাকতে ছটফট করেছি। কিন্তু ও চলে যাওয়ার পর মনে হল নিজের সম্মান রাখার জন্যে আমার উচিত স্বাবলম্বী হওয়া। দুবছর ধরে যখন সেই চেষ্টা করেছি তখন মনের পাড় ভাঙতে শুরু করেছিল। বারংবার তোমার কথা মনে পড়ত। সত্যি বলছি আমেরিকায় যাওয়ার পর থেকেই তুমি আমাকে এত টানতে যে তোমাকে ভুলে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভুলতে পারিনি। তাই—

'আমার কাছে চলে এলে? কেমন আছি দেখতে?'

'না। আমি তোমার কিছুই জানতাম না। তুমি লিখছ, লেখক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছ এসব কথা সানফ্রান্সিসকোতে থেকে জানাও সম্ভব নয়। এবার দেশে এসে আনন্দবাজারে একটা বই-এর বিজ্ঞাপনে তোমার ছবি দেখলাম। একটু মোটা হয়েছ। খুব অবাক এবং খুশি হয়ে খোঁজ খবর নিতেই তোমার এখনকার অবস্থা জানতে পারলাম। তুমি বিয়ে করোনি তা তোমার সমস্ত ভক্তরাই জানে দেখছি। টেলিফোন নম্বর আর ঠিকানা পেতে অসুবিধে হল না। এই আমার গল্প। চিন্ময়, তোমার কাছে না এসে আমার কোন উপায় ছিল না।'

'আমার কোন লেখায় যে তুমি নেই এটা তখন ফোনে বললে। কিসে জানলে?'

'তোমার সমস্ত বই কিনে পড়েছি আমি টেলিফোন করার আগে।' রাত্রি হাসল, 'আমি তোমার মনে একটুও দাগ কাটিনি চিন্ময়? খুব নির্লজ্জের মত জিজ্ঞাসা করছি যদিও।'

'মনের মাটির ওপর সময়ের পলি পড়লে পলিটাই চোখে পড়ে। যাক, কিছু খাবে ?'

'আমি এখানে খেতে আসিনি চিন্ময় !'

'তাহলে ?'

'তোমার বান্ধবীকে দেখতে এসেছি।'

চিন্ময় হাসল, 'দেখা হয়ে গেলে তো এক মুহূর্ত এখানে থাকবে না তুমি। তাই অন্য কথা বল। তোমাকে দেখে আমার ভাল লাগছে।'

'নেশার ঘোরে বলছ ?'

'নেশা হবার মত মদ কখনও খাই না আমি।'

রাত্রি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে করনি কেন ?'

'বোকামি করতে চাইনি।'

'বোকামি ? সুন্দরী ভাল মেয়েকে বিয়ে করতে তো পারতে !'

'সব মেয়েই এক। শুধু তাদের মুখগুলো আলাদা বলে পৃথকভাবে চেনা যায়।'

'বিয়ে না করার পেছনে এটাই কি যুক্তি ?'

'পনের বছর আগে আমি ছিলাম এক বেকার তরুণ। কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করার আগে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করত। পনের বছরে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে টের পাইনি কোথায় পৌঁছেছি, কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে কিনা তাও জানতে চাইনি।'

'কেন ? তোমার তো মেয়ে ভক্ত প্রচুর। তাদের কেউ—

'ওঠো।'

'মানে ?'

'যাকে দেখতে এসেছ তাকে দেখিয়ে দিই। হয়তো তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন না ! দূর থেকে দেখেই চলে আসবে।'

'কেন ? এত অহঙ্কার ?'

'অহঙ্কার ? তা বলতে পার। ওহো। আমি যাব না।' চিন্ময় ডাকল, 'ধরণীদা ?'

ধরণীদা আসতে দেরি করল না। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কি করছেন?'

'বসে আছেন।'

'স্নান হয়ে গিয়েছে?'

'না। কোন কথা শুনছেন না। বারংবার বলছি স্নান করে নিন খাবার দেব, তবু কথা কানে নিচ্ছেন না। কি করব বুঝতে পারছি না।'

'আশ্চর্য! কথাগুলো আমাকে আগে বলবে তো?' চিন্ময় ফাঁপরে পড়ল। বিয়ার খেয়ে জননী দেবীর সামনে যাওয়াটা খুব অন্যায় হবে। সে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি এঁকে নিয়ে ওঁর ঘরে যাও। যদি আলাপ করতে চান করিয়ে দেবে।'

ধরণীদা রাত্রিকে একবার দেখল, 'কি পরিচয় দেব?'

চিন্ময় মৃদু হাসল, 'ওঁর পরিচয় উনি দেবেন। যাও রাত্রি।'

একটু অনিচ্ছা দেখিয়ে রাত্রি ধরণীদাকে অনুসরণ করল। বিয়ার শেষ হয়ে গেল চিন্ময়ের। দুটোর বেশি সে কখনও খায় না। এখন ঈষৎ মেজাজ এসেছে। এইবার স্নান করে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘন্টা দেড়েক ভাত ঘুম। ব্যাপারটা যদিও খুব অন্যায় কিন্তু এটা সে রোজ করে না। ঘুমবার পর সন্ধের আগে পর্যন্ত লেখা। কিন্তু রাত্রি থাকলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। তারপরেই এ সব ছাপিয়ে জননী দেবীর কথাটা মাথায় এল। ভদ্রমহিলা হঠাৎ এমন আচরণ করছেন কেন? সকালে সে যখন ক.. বলতে গিয়েছিল তখন তো বেশ সহযোগী মানসিকতা ছিল।

চিন্ময় আর একটা সিগারেট ধরাল। মিনিটখানেক পরেই রাত্রি ফিরে এল। মুখ গম্ভীর, 'উনি কে?'

'জিজ্ঞাসা করনি?'

'না। পেছন থেকে দেখলাম। আমার সঙ্গে এমন রসিকতার মানে কি?'

'রসিকতা নয়। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে একা আছি কিনা আমি তার জবাবে বলেছি, না, একজন মহিলাকে বৃন্দাবন থেকে এনেছি।'

ঠোঁট কামড়ালো রাত্রি, 'ইনি তোমার কেউ হন না?'

'আগে কেউ হতেন না।'

'আশ্চর্য!'

চিন্ময় হাসল, 'তুমি তো কিছুই খেলে না। আমি এবার স্নান করব রাত্রি।'

'তুমি এত পাল্টে গিয়েছ চিন্ময়?'

'কোন কথায় এই প্রশ্ন?'

'তোমার মনে কি একটুও আবেগ অবশিষ্ট নেই?'

'আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এটাও সত্যি আমার স্নান করা দরকার। তুমি কলকাতায় কতদিন আছ আর?'

'আমি জানি না। আবার যদি আসি তোমার কি আপত্তি হবে?'

'না-না। তুমি এলে, কথা বললে আমার ভাল লাগে।'

'এলাম।' রাত্রি আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

সেই অপরাহ্নে ঘুমের পর লিখতে বসে জননীদেবীর কথা মনে পড়ল ধরণীদাকে ডাকল চিন্ময়, 'উনি দুপুরে কিছু খেয়েছেন?'

'দুটো মিষ্টি আর জল। মনে হচ্ছে শরীর খারাপ।'

'কেন?'

'মুখ চোখ যেন কিরকম?' ধরণীদা জানাল।

লেখার টেবিল ছেড়ে জননী দেবীর ঘরে চলে এল চিন্ময়। ঢোকার আগে একটু ভেবে নিল বিয়ারের গন্ধ এখনও শরীরে আছে কিনা। নিঃসন্দেহে পা বাড়াল ভেতরে। জননী দেবী খাটে বসে নেই। পাথর রাখা কাঠের আসনের সামনে মেঝেতে একটা কাপড় পেতে পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। চিন্ময় কাছে গিয়ে ডাকল, 'মা। কিছু খাননি কেন?'

জননী দেবী কোন জবাব দিলেন না। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে এসে কি আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

মাথা নাড়লেন তিনি, না।

'তাহলে ? আপনি না খেয়ে থাকলে নিজেকে অপরাধী মনে করব।'

'খাওয়ার ইচ্ছেটাই হচ্ছে না। গা বমি বমি লাগছে।'

এবার কাতর চোখে তাকালেন জননী দেবী। সেই চোখ লাল টকটকে। চিন্ময় চমকে উঠে কপালে হাত দিল। খসখসে চামড়ার নিচে যেন উনুন জ্বলছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, আপনি শুয়ে থাকুন। বৃন্দাবনে জ্বরটর হলে কি ওষুধ খেতেন ? ট্যাবলেট, ক্যাপসুল না পুরিয়া ? মনে আছে ?'

'বৃন্দাবনে আমার কখন অসুখ করেনি। শরীরে অসুখ। শুধু মনে সুখ ছিল না।'

চিন্ময় উঠে দাঁড়াল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে ধরণীদাকে ডাকল 'শোন, বুড়ো মানুষ অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি ওষুধ বেশি পছন্দ করে ?'

'হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, এই সব।'

'এপাড়ায় কেউ হোমিওপ্যাথি করে বলে জানো ?'

'না তো আগের পাড়ায় ছিল।'

'দূর। আমার চেনাজানা বন্ধুবান্ধবরা কেউ হোমিওপ্যাথ নয়। কি যে করি! বিনা চিকিৎসায় তো ফেলে রাখা যায় না।' চিন্ময় ঘরে ফিরে টেলিফোনের নম্বর ঘোরাল। সুমন্ত সেন ভাল ডাক্তার। সম্পর্কও ভাল। সুমন্তকে মোটামুটি ব্যাপারটা বলল সে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে সুমন্ত এসে গেল। জননী দেবীর ঘরে ঢোকার আগে সুমন্তকে বলল, 'কিছু মনে করো না, জুতোটা খুলতে হবে। উনি খুব, বুঝতেই পারছ।'

সুমন্ত আপত্তি করল না। জননী দেবী একই ভঙ্গিতে শুয়েছিলেন। সুমন্ত যখন তাঁকে পরীক্ষা করছিল তখন একটুও আপত্তি করলেন না। দেখা হয়ে গেলে বাইরে এসে সুমন্ত বলল, 'কি মুশকিল হল বলতো।'

'কেন ?'

'আরে, কি চিকিৎসা করব এঁর ? শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই। না খেয়ে অপুষ্টি এসে গিয়েছে ? প্রেসার নেই বললেই চলে। বেঁচে আছেন কি করে কে জানে ? ভদ্রমহিলা কে ?'

'আমার আত্মীয়া।'

'ও। কি করা যায়?' সুমন্ত ভাবছিল।

'কি হয়েছে ওঁর?'

'বোঝা মুস্কিল। বুকে-পিঠে সর্দি বসেনি এই রক্ষে। সালফা বা মাইসিন সহ্য করতে পারবেন কিনা, তাও বুঝতে পারছি না।'

'আশ্চর্য! তুমি একজন নামকরা ডাক্তার। যাহোক কিছু করো।'

'শোন, আমি কোন রিস্ক নেব না নার্সিং হোমে ভর্তি করবে?'

'মাথা খারাপ। এক ঘণ্টাও টিঁকবে না।'

'বেশ। একটা কাগজ দাও।' খসখস করে প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে গেল সুমন্ত। সেই সঙ্গে কি খাবেন তার তালিকা। ওষুধ বলতে খুব মোলায়েম জ্বরের ট্যাবলেট আর একটা সব মেলানো মিক্সচার। সঙ্গে ভিটামিন। পথ্যের মধ্যে ছানা আছে। ধরণীদাকে দিয়ে তখনই ওসব আনিয়ে নিল চিন্ময়। তারপর নিজে ঘরে ঢুকে জননী দেবীকে প্রায় জোর করেই নিয়ম করে খাওয়াতে লাগল। রাত্রের দিকে দেখা গেল জ্বর কমছে। দীর্ঘকাল বাদে শরীর সামান্য ওষুধের স্পর্শ পেয়ে তাকে কাজে লাগাচ্ছে।

রাত দশটার পর যেন নিঃশ্বাস নিতেই চিন্ময় বাড়ি থেকে বের হলো। পার্কিং লটে গাড়ি রাখা আছে। ড্রাইভার এখন ছুটিতে। তার ফিরতে দিন তিনেক বাকি। চিন্ময় বছর দু'য়েক আগে ক্লাব থেকে ড্রাইভিং শিখেছে। কিন্তু গাড়ি চালাতে মোটেই ইচ্ছে করে না তার। আজ সে গাড়ি বের করল। ঢাকুরিয়া ব্রিজ পেরিয়ে মনে হল কলকাতার ঘুমের সময় হয়েছে। কার বাড়িতে যাওয়া যায়? সুবিনয়? না। লোকটা বড্ড বকে। অসীমদের ওখানে প্রতি রাত্রেই হেভি গ্যাঞ্জাম। শেষ পর্যন্ত লেক রোডে নন্দনের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল সে। এখন ঘড়িতে মাত্র সাড়ে দশটা। নন্দন ব্যবসাদার। কিন্তু সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। ওর বউ নন্দিতা খুব ভাল হোস্টেস। বেল দেওয়ার মিনিট খানেক বাদে নন্দিতাই দরজা খুলল, 'ওমা, আপনি। কি যে ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। উঃ। কি ভাল।'

'ভেতরে আসতে পারি ?'

'হ্যা। এম্মা, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম।'

'অবশ্যই নন্দনের।'

'কি করে দেখব ? ও তো কলকাতায় নেই। কানপুরে গিয়েছে।' নন্দিতার কথা শেষ হবার আগে চিন্ময় ওঁদের দেখতে পেল। চার জন মহিলা। মদ্যপান করছেন। নন্দিতাও ওঁদের সঙ্গ দিচ্ছিল। একজন, মিসেস পাকড়াশি বললেন, 'ও, এই সব হচ্ছে। ক্লাবে শুনলাম লেখক মশাই দিল্লি গিয়েছেন। আর রাত দুপুরে নন্দিতার বাড়িতে অভিসার ?'

'এসেছিলাম নন্দনের কাছে। জানতাম না ও কলকাতায় নেই।'

'ওম্মা, তাতে কি হয়েছে! আমি তো আছি। বসুন আপনি। কি দেব ? হুইস্কি ?'

'আজ রাত্রে আমি মদ্যপান করব না।'

সঙ্গে-সঙ্গে চার মহিলা হেসে উঠলেন। এ ওঁর গায়ে। মিসেস সামন্ত বললেন, 'তবে অন্য কিছু পান করার মতলবে নাকি ? তাই বলি! লেখক মশাই-এর নাক তো আকাশে লেগে থাকে। তা ভাই নন্দিতা, তুমি ভাগ্যবতী।'

'দূর। আপনারা বাজে বকছেন। সারাদিনে খুব বোর হয়েছিলাম তাই ভাবলাম নন্দনের সঙ্গে একটু আড্ডা মারা যাক।' চিন্ময় মাথা নাড়ল, 'চলি।'

ওঁদের কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে এল সে। একটু গোলমাল হল। কাল সকাল দশটার আগেই টালা টু টালিগঞ্জে বুলেটিন বেরিয়ে যাবে। এই চারজন মহিলাকে ভয় পায় না এমন মানুষ ক্লাবে খুব কম আছেন। নিত্যানন্দ মণ্ডল নামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে মিসেস পাকড়াশির প্রেম হয়েছিল। আবেগে কোন এক নির্জনে নিত্যানন্দ তাকে চুম্বন করেছিল। সে বাড়ি ফিরতেই স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোথায় ছিলে ? ছিঃ, তোমার মুখ দেখতেও ঘেন্না করে।'

কারণ জিজ্ঞাসা করতে ভদ্রমহিলা বলেছিলেন একটু আগে মিসেস পাকড়াশি টেলিফোনে বলেছেন নিত্যানন্দ ওঁর রুমাল নিয়ে গিয়েছেন ভুল করে। ওটা যেন ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কারণ রুমাল দিলে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। স্ত্রীর কথায় পকেটে হাত দিয়ে নিত্যানন্দ আবিষ্কার করে সত্যি সেখানে একটি মেয়েদের রুমাল রয়েছে। সেই থেকে বাড়িতে অশান্তির আগুন জ্বলছে। মিস্টার পাকড়াশি অত্যন্ত গোবেচারা মানুষ, স্ত্রীর দ্বারা শাসিত হয়ে থাকাই পছন্দ করেন।

সকালে চা খেয়ে জননী দেবীর ঘরে ঢুকল চিন্ময়। তিনি শুয়েছিলেন খাটে। মুখ দেখে বোঝা গেল জ্বর নেই। ধরণীদা যে চায়ের কাপ-ডিস দিয়ে গিয়েছে তা পড়ে রয়েছে একপাশে। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন।'

মাথা নেড়ে ভাল বললেন জননী দেবী। বলে হাসলেন।

'চা খাননি কেন?'

'বড্ড মিষ্টি।'

'ও, কম মিষ্টি দিয়ে চা করে দিতে বলবেন তো? আপনি কেন লজ্জা পাচ্ছেন?'

'আমি নিজে রান্না করব।'

'বাঃ, খুব ভাল কথা। আজকের দিনটা যাক।'

'না। আমি এখন ভাল হয়ে গিয়েছি।'

'বেশ। ধরণীদাকে বলে দিচ্ছি।'

মন ভাল হয়ে গেল। নিজের ঘরে ফিরে আসতেই তিনটে কাগজ এল। চিন্ময় দেখল সেই বিজ্ঞাপনটা সব কাগজেই বেরিয়েছে। অনাদি মণ্ডল এটা কি করেছে? বক্স নম্বরের বদলে নিজের টেলিফোন নম্বর দিয়েছে! তারপরেই মনে হল ভালই করেছে। যদি কেউ যোগাযোগ করতে চান তাহলে তো করতে দেরি হবে না। এক তাঁরা যদি কলকাতার বাইরের মানুষ হন তাহলেই মুস্কিল।

দুপুরে ধরণীদা এসে বলল, 'আজ ও ঘরে ভাত, আলুসেদ্ধ আর উচ্ছে সেদ্ধ হয়েছে।'

'আর কিছু দাওনি?'

'সব দিয়েছিলাম। বললেন ওতেই ওঁর হয়ে যাবে।'

'ছানাটা বিকেলে দিয়ে দেবে'।

'সেটা উনিই কেটে নেবেন। দুধ দিয়ে এসেছি।'

'মাঝে মাঝে গিয়ে খোঁজ নেবে কোন প্রয়োজন আছে কিনা।'

'সে আর বলতে হবে না। আজ আমার সঙ্গে বেশ কথা বলছেন।'

সন্ধ্যেবেলায় অনাদি মণ্ডল এল। মোটাসোটা কালো চেহারার ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষ। এসে বললেন, 'এই নিন, এখানে সব লিখে রেখেছি।'

'কি এটা?'

'চারটে টেলিফোন এসেছিল তার বিবরণ।'

চিন্ময় কাগজটা নিল। প্রথম ভদ্রলোক জানিয়েছেন তাঁর পিসিমা ওই সময়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। পাঁচ বছর আগে তাঁকে লেখা চিঠি ফেরত এসেছে। নিজের নামধাম জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়জন লিখেছেন ছত্রিশ নয়, কুড়ি বছর আগে তাঁর দিদি বৃন্দাবনবাসিনী হয়ে সংযোগ ছিন্ন করেছেন। তৃতীয়জনেরও একইরকম বক্তব্য। চতুর্থজনের বিবরণ পড়ে কপালে ভাঁজ ফেলল চিন্ময়, 'আটত্রিশ বছর আগে নীহারিকা দেবী নামের এক বিধবাকে তাঁর বাবা বৃন্দাবনে রেখে এসেছিলেন। তখন নীহারিকা দেবীর বয়স ছিল চল্লিশ। বাবা বেঁচে থাকতে একমাত্র তিনিই মেয়ের খবর রাখতেন এবং টাকা-পয়সা পাঠাতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ভাইরা সংযোগ ছিন্ন করেছে। যিনি ফোন করেছেন তিনি দু'বার বৃন্দাবনে গিয়ে যথেষ্ট খোঁজ করে নীহারিকা দেবীর কোন সন্ধান পাননি। নীহারিকার উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট, সুন্দরী, ফসা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল এবং বাঁ চিবুকে একটি তিল ছিল। বিজ্ঞাপনের মহিলার সঙ্গে যদি এই বর্ণনার মিল থাকে তাহলে অবিলম্বে তাঁকে যেন জানানো হয়। এখন নীহারিকা দেবীর সঠিক বয়স আটাত্তর।'

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'এঁর সঙ্গে ফোনে কি আপনি কথা বলেন ?'

'হ্যাঁ। বুড়োমানুষ। বললেন, চুরাশি বছর বয়স। থাকেন হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রিটে।

'একটু বসুন আপনি।' চিন্ময় উঠে ভেতরে চলে এল। জননী দেবী জানলা দিয়ে সন্ধ্যার আকাশ দেখছিলেন। একদিন পেটে ভাত পড়তেই চেহারা স্বাভাবিক হয়েছে। পায়ের শব্দে চোখ ফেরালেন। চিন্ময় বলল, 'শুধু সেদ্ধভাত খেলে চলবে না।'

'আমি তো খুব তৃপ্তি করে খেলাম।' তিনি হাসলেন, 'বাসনপত্র আমাকে ধুতে দিল না ও। কোন কাজ যখন নেই।'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আপনি।' চিন্ময় ওঁর চিবুক লক্ষ্য করছিল। এত ভাঁজ পড়েছে যে তিল ছিল কিনা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল, 'আরে, আপনার চিবুকে কি লেগেছে ? বাঁ দিকে ?'

বৃদ্ধা হাত দিলেন। তারপর মনে পড়ে যেতে বললেন, 'ও। এখনও আছে নাকি ? একসময় এখানে একটা তিল ছিল।'

আরও দু-একটা কথা বলে চিন্ময় বেরিয়ে এল। মনে মনে সে বেশ উত্তেজিত। অনাদি মণ্ডল বসে ছিলেন। ধরণীদা এর মধ্যেই তাঁকে চা দিয়ে গেছে। চিন্ময় বলল, 'আমি এখনই হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে যাব। আপনার কি প্রোগ্রাম ?'

'কিছু না। কেন ?'

'আপনি তাহলে আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোন আপত্তি নেই। সঙ্গে গাড়ি আছে। কিন্তু যার কথা লেখা হয়েছে বিজ্ঞাপনে তিনি কোথায় ? সত্যি তেমন কারো সন্ধান পেয়েছেন না পুরোটাই বানানো।'

'আমার কল্পনাশক্তির ওপর আস্থা কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।' হেসে বলল চিন্ময়।

'না-না। আমি তখনই ভেবেছি পুরো ব্যাপারটা আপনি গল্প বের করার জন্যে ফেঁদেছেন। দারুণ আইডিয়া। একেবারে যাকে বলে

পাবলিকের পেটের ভেতর থেকে খবর টেনে বের করা। এ মশাই এদেশে আপনার আগে কেউ করেনি। বই যখন বের হবে তখন বিজ্ঞাপনে এই ব্যাপারটা উল্লেখ করতেই হবে।' চোখ বন্ধ করলেন অনাদিবাবু। উনি চোখ বন্ধ করেই ভাবেন।

হাজরার মোড় পেরিয়ে প্রায় আদি গঙ্গার গায়ে পৌঁছে ডান দিকে ঘুরল ওরা। হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট পুরনো আমলের রাস্তা। কাঠের গোলা, ইঁট বের করা বাড়ি, বেশ মিল আছে উত্তর কলকাতার সঙ্গে। অনাদিবাবু মাঝে মাঝেই জানলা দিয়ে মুখ বের করে ঠিকানার হদিশ নিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাড়িটা পাওয়া গেল। রাস্তা থেকে একটা গলির মধ্যে যেখানে গাড়ি ঢুকবে না। চিন্ময় আর অনাদি মণ্ডল গলিটার শেষ বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন এক মধ্য বয়সী ভদ্রলোক। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু'জনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

'এ বাড়িতে শীতাংশু দত্ত থাকেন?'

'আপনারা?'

এবার অনাদি মণ্ডল জবাব দিলেন, 'আমরা কলেজ ষ্ট্রীট থেকে আসছি। বই-এর ব্যবসা করি।'

'ও। কিন্তু মেজ জ্যাঠার তো বই-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।'

'না, না। একটু দরকার আছে ওঁর সঙ্গে।'

'ও।' ভদ্রলোক আবার সন্দেহের চোখে তাকালেন। তারপরে বললেন, 'আসুন আপনারা আমার সঙ্গে। উনি থাকেন ছাদের ঘরে। হুট্ করে অচেনা মানুষকে বাড়ির ভেতর দিয়ে পাঠানো উচিত নয়, বুঝতেই পারছেন।'

ভদ্রলোক হাঁটতে শুরু করলেন। পেছন পেছন যেতে যেতে অনাদি মণ্ডল জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনি আপনার জ্যাঠামশাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবারা তিন ভাই ছিলেন। বড় জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছেন পঁচিশ বছর আগে। মেজ জ্যাঠামশাই তো চুরাশিতে পড়েছেন। এখনও অবশ্য শক্ত। বিয়ে থা করেননি তো।' মাঝপথে থেমে

গেলেন ভদ্রলোক, 'ওই সিঁড়ি ধরে সোজা ওপরে চলে যান। দোতলা পেরিয়ে ডান দিকের সিঁড়ি। বলে একটা দড়ি ধরে টানলেন, কোথাও ঘণ্টা বাজল।

ছাদের ঘরে দরজায় পর্দা ঝুলছে। চিন্ময় একটু ইতস্তত করে পর্দা সরাল, 'ভেতরে আসতে পারি? আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে কলেজ স্ট্রীট থেকে আসছি।'

জানালার ধারে চেয়ারে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। পরনে পরিষ্কার ধুতি আর ফতুয়া। টেবিল থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে দিয়ে বললেন, 'আসুন। এখানে বসুন।'

সামনেই দুটো চেয়ার খালি ছিল। চিন্ময়রা সেখানে বসল। অনাদি মণ্ডল বললেন, 'আজ সকালে আপনার টেলিফোন আমিই ধরেছিলাম। ইনি—।'

নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছিল না চিন্ময়। অনাদিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বিজ্ঞাপনটা আমিই দিয়েছিলাম।'

'ও। এই বিজ্ঞাপন আপনি কেন দিলেন?' মার্জিত গলার স্বর।

'কদিন আগে বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। খুব কষ্টে আছেন। স্মৃতিও ঠিক কাজ করছে না। তাই ভাবলাম ওঁর আত্মীয়স্বজনদের যদি খবরটা দেওয়া যায় তাহলে শেষ বয়সে একটু আরাম পেতে পারেন।' চিন্ময় বলল।

'তাই? আমি আজ সবকটা বাংলা কাগজে এই বিজ্ঞাপন পড়েছি। স্বার্থ না থাকলে কোন মানুষ অকারণে এত খরচ করে না আজকাল।'

'কি জানি! ওঁকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল, তাই হয়তো।'

'দেখুন বিজ্ঞাপনটা পড়ার পরে আমি একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম। তাই টেলিফোন করেছি। পরে ভেবে দেখলাম অসম্ভব, নীহারিকা বেঁচে থাকতে পারে না।'

'নীহারিকা দেবী আপনার কে হন?'

শীতাংশু দত্ত প্রশ্নটা শোনামাত্র জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তারপর একটু অন্যরকম গলায় বললেন, 'পরিচয় দেবার মত কোন সম্পর্ক

আমাদের ছিল না। যাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল তিনি কি নিজের নাম বলতে পেরেছেন?'

'না। কিছুই মনে নেই তাঁর।'

'চিবুকে তিল ছিল?'

'যদ্দুর মনে পড়ছে ছিল।'

'সত্যি? ভেবে দেখুন!'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! নীহার বেঁচে আছে? আমি এত খুঁজেও ওকে বৃন্দাবনে পাইনি কেন! কোথায় গেলে ওকে পাওয়া যাবে বলুন তো?'

অনুনয়ের ভঙ্গি করলেন শীতাংশু।

'এই বয়সে আপনি ওখানে যেতে চান?'

'হ্যাঁ। একাই যাব। এদের তো কাউকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আপনারা কি নিচে বলেছেন কেন আমার কাছে এসেছেন?'

অনাদি মণ্ডল বললেন, 'না, না। সেটা তো আপনি টেলিফোনে বলেই দিয়েছিলেন।'

চিন্ময় অনাদির দিকে তাকাল, এটা সে আগে শোনেনি। শীতাংশু বললেন, 'নীহারের কথা এরা কেউ জানে না। আমি আর জানাতেও চাই না। আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

চিন্ময় বলল, 'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল যমুনার ধারে।'

'ঠিকানা?' বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'বলতে পারেননি।'

'উঃ।' কপালে হাত দিলেন শীতাংশু, 'কিভাবে খুঁজব তাহলে?'

'আপনি ওঁকে কতদিন দ্যাখেননি?'

'আটত্রিশ বছর। তখন আমার বয়স চুয়াল্লিশ। ওর চল্লিশ।'

'আপনি কি ওঁকে ভালবাসতেন?' সাহস করে বললো চিন্ময়।

উত্তরটা নীরবে মাথা নেড়ে দিলেন শীতাংশু 'ওর বিয়ের আগে থেকেই আমরা পরস্পরকে চিনতাম। প্রায় জোর করেই ওর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি আর বিয়ে-থা করিনি। বিয়ের পর ও সংসার

করলেও যে আমাকে ভুলতে পারেনি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি ওদের সংসারে আমার ছায়া ফেলতে দিইনি।'

'তারপর ?'

'তারপর হঠাৎই ওর স্বামী মারা গেল। তুটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। তাদের নিয়ে নীহার ফিরে এল বাপের বাড়িতে। আর সেই সময় আবার যোগাযোগ হল আমার সঙ্গে। যাকে ভালবাসি সে বিধবা হলেও আমার কিছু যায় আসেনি, বিয়ে আমি করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নীহার মন স্থির করতে পারেনি।' সবচেয়ে রেগে গেলেন ওর বাবা। ভাইরা ক্ষিপ্ত হল। আমার নামে নানান কুৎসা তৈরি করে ওকে শোনানো হল। সেগুলো শুনেই বোধহয় ওর জেদ চেপে গেল আমাকে বিয়ে করতে। ভাইরা এবার ছেলে-মেয়েকে বিষাক্ত করলেন ওর বিরুদ্ধে। নিজের মাকে চরিত্রহীনা বলে ভাবতে আরম্ভ করল তারা। আর কাউকে না জানিয়ে একদিন চুপচাপ নীহারকে বৃন্দাবনে রেখে এলেন তার বাবা। নীহারকে বোঝানো হয়েছিল চল্লিশ বছরের বিধবার গোপাল ছাড়া আর কোন দিকে মন দেওয়া অপরাধ। ভাবতে অবাক লাগে নীহার সেটা বিশ্বাস করল।'

'আপনাকে তিনি কোন চিঠিপত্তর দেননি ?'

'না। যে তার পূর্বজীবনের কথা ভুলে যেতে চায় সে চিঠি দেবে কেন ? আমি জানতাম নীহারের সামনে গেলে সে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু তুর্ভাগ্য এমন যে দেখাই পেলাম না। তবু আমি আর একবার যাব। ওর দেখা পেতেই হবে।'

'কিছু মনে করবেন না, দেখা পেলে কি করতে চান ? আপনারা কি একসঙ্গে থাকতে পারবেন ?'

'জানি না। কিন্তু ওর সঙ্গে আগে কথা বলতে চাই।'

'আচ্ছা, আর একটা কথা, ওঁর ভাই বেঁচে আছেন এখনও ?'

'আছে তো জানি।'

'ঠিকানা বলতে পারেন ?'

'কেন ?'

'আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আপনি কি করেন ?'

অনাদি মণ্ডল বোধহয় সুযোগ খুঁজছিলেন বলে ফেললেন, 'ইনি একজন বিখ্যাত লেখক।'

'ও। নীহারের ভাই থাকে তাদের পুরোন বাড়িতে। হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে। কাছেই।'

অনাদি মণ্ডল ঠিকানা আর নাম লিখে নিলেন। এখন রাত প্রায় ন'টা। এই সময় কারো বাড়িতে পরিচয়হীন অবস্থায় যাওয়া শোভনীয় নয়। কিন্তু অনাদি মণ্ডল বললেন, 'আরে মশাই গল্প দারুণ জমে উঠেছে। চোখ কান বুঁজে যাওয়াই যাক।'

নীহারিকা দেবীর ভাই-এর নাম হরিমাধব গুহ। উকিল। পাড়ায় নামডাক আছে। পঁচাত্তরের ওপরেই বয়স। বাড়ির বাইরের ঘরেই চেম্বার। একাই বসে ফাইল পড়ছিলেন। ঢোকামাত্র বললেন, 'মামলা করে ফেলেছেন না করবেন ?'

'মানে ?' অনাদি মণ্ডলও ঘাবড়ে গেলেন।

'অনেকে বাজে উকিলকে দিয়ে কেস করিয়ে যখন পস্তায়, তখন এই শর্মার কাছে আসে।'

'না, না। আমরা মামলা নিয়ে আসিনি।'

'ও। তাহলে ?' বেশ বিরক্ত হলেন হরিমাধববাবু।

এবার চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন।'

'কি রকম ?'

'নীহারিকা দেবী আপনার দিদি ?'

হঠাৎ মুখ কালো হয়ে গেল ভদ্রলোকের। সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো ? এই নাম আপনারা জানলেন কোত্থেকে ?'

'সবই বলছি। আগে বলুন কথাটা সত্যি নাকি ?'

'দুর্ঘটনাক্রমে সত্যি। কিন্তু ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছি।'

'কেন?'

'সেটা আপনাকে বলব কেন?'

'ও। তাহলে তো কোন কথাই চলে না।'

'দাঁড়ান। দাঁড়ান। ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'নীহারিকা দেবী বৃন্দাবনে আছেন। উনি যদি এখন আপনার কাছে ফিরে আসেন, তাহলে আপনি তাঁকে জায়গা দেবেন?'

'অসম্ভব। ওরকম চরিত্রহীনা মেয়েছেলেকে ঢুকতে দেব না।'

'আপনি কিন্তু নিজের দিদিকে গালাগালি করছেন।'

'দিদি! আমার কোন দিদি নেই।'

'শীতাংশু দত্তকে আপনি চেনেন?'

'ওর নাম কি করে জানলেন?'

'ডায়েরিতে পেয়েছি।'

'কার ডায়েরি?'

'নীহারিকা দেবীর।'

'ওই শুয়োরটার জন্যই আমাদের ফ্যামিলিতে কলঙ্ক লাগল। বাবা যদি তখন দিদিকে বৃন্দাবনে রেখে না আসতেন তাহলে কি হত কে জানে!'

'শীতাংশুবাবু কি করেছিলেন?'

'হিন্দুঘরের বিধবাকে যার দুটো বাচ্চা আছে, তাকে লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করতে চেয়েছিল লম্পট!'

'ওঁরা কি পরস্পরকে ভালবাসতেন?'

'ভালবাসা? খেপেছেন? কিন্তু আপনাকে এসব বলছি কেন?'

'আমরা নীহারিকা দেবীর আত্মীয়দের খোঁজ করছি।'

'কেন? তিনি কি লটারির টিকিট পেয়েছেন?'

'ব্যাপারটা সেইরকম।'

'তাই? বলবেন তো এতক্ষণ। কত টাকা?'

'অনেক। নীহারিকা দেবীর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে আমরা কথা

বলছি।' ওঁর দুই ছেলেমেয়ে আছে। তাদের ঠিকানা বলতে পারেন ?'

'মেয়ে আছে নিউ ইয়র্কে। বিরাট অবস্থা। মায়ের টাকার দরকার নেই। আর ছেলে মনে করে তার মা মারা গিয়েছে।'

'সেটা ওর মুখেই শুনতে চাই।"

হরিমাধব ঠিকানাটা দিলে। ফার্ন রোডের। দিয়ে বললেন, 'মুখে যাই বলি এ কথা অস্বীকার করতে পারব না যে আমরা এক মায়ের সন্তান। দিদির তেমন দোষ ছিল না। ওই শীতাংশুটাই বদমাস। তার জন্যেই এমন হয়েছিল।'

'ঠিক কি হয়েছিল ?'

'এসব কথা মুখে বলতে লজ্জা করে মশাই। দিদিকে ফুসলে নিয়ে শীতাংশু হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। বাবা সেখান থেকে ধরে আনেন।'

'কিভাবে যোগাযোগ হত ওঁদের ?'

'বাবার দোষ। বাবা ছিলেন স্কুলমাস্টার। শীতাংশু ছাত্র। সেই সুবাদে বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। দিদির বিয়ের পরেও আসত।'

চিন্ময় এবার উঠল, 'আচ্ছা, চলি এখন।'

'কিন্তু, ওই টাকাটার কি ব্যবস্থা হবে ?' হরিমাধব প্রশ্ন করামাত্রই এক ভদ্রমহিলা বাইরে থেকে ঢুকলেন। পেছনে এক ভদ্রলোক। হরিমাধব তাদের বললেন, 'বড্ড দেরি করে ফিরলে বউমা। আমার তো চিন্তা হয়।'

মহিলা চিন্ময়ের দিকে তাকালেন ভেতরে যেতে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখেমুখে অবাক হবার অভিব্যক্তি এল। তিনি চটপট ঘুরে তাঁর স্বামীকে চাপা গলায় কিছু বললেন। এবার স্বামী চিন্ময়ের দিকে তাকালেন। চিন্ময় বুঝল পরিচয় ফাঁস হতে চলেছে। সে অন্যদিকে ইসারা করে বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়িতে উঠতে উঠতে শুনল গুহ মশাই-এর চেম্বারে হৈচৈ পড়ে গেছে।

সকালের চা দিতে এসে ধরণীদা বলল, 'আজ উনি খুব ভোরে উঠে

স্নান সেরে নিয়েছেন। আমি চা করেদিয়েছি, সেটা খেয়েছেন।'

'জ্বরের পরেই এত তাড়াতাড়ি স্নান করা কি ঠিক হল?'

'শরীর চাইলে করবেন না কেন? আজ দুপুরে ভাত, ডাল সেদ্ধ আর একটা তরকারি রান্না করবেন। বলেছি একটু বেশি রান্না করতে।'

'কেন?'

'কেমন রাঁধেন দেখতে হবে না?'

'আমার খোঁজ করেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি বলেছি ঘুমাচ্ছেন।'

গাড়ী না নিয়ে ফাঁকা মিনিবাসে গড়িয়াহাটে নেমে হেঁটে চিন্ময় চলে এল ফার্ন রোডে। সকাল বলেই চারধার বেশ ছিমছাম, শান্ত। ঠিকানা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। পাঁচতলা বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাট। দরজার ওপরে নাম লেখা রয়েছে, স্বামী-স্ত্রী'র।

কলিং বেলের বোতামে চাপ দেওয়ামাত্র দরজা খুলে গেল। বছর বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের এক মহিলা মুখ বের করে বিস্ময়ে যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। চিন্ময় ভদ্রলোকের নাম করতেই তিনি বিগলিত হয়ে বললেন, 'আসুন-আসুন, কি সৌভাগ্য আমাদের আপনি যে এত সকালে আসবেন আমরা ভাবতেই পারিনি। ও এখনই চলে আসবে, বাজারে গিয়েছে। ভেতরে আসুন, প্লিজ।

চিন্ময় অবাক হল, 'আমি আসব আপনারা জানতেন?'

'হ্যাঁ।' অনেকখানি মাথা দোলালেন মহিলা, 'কাল রাত্রেই মামাবাবু খবর দিয়েছিলেন। শুনে অবধি আমি স্থির থাকতে পারছি না। আপনি যে আমাদের বাড়িতে আসবেন আমি ভাবতেই পারিনি। 'উঃ কি আনন্দ হচ্ছে যে কি বলব!'

সোফায় বসে চারপাশে তাকিয়ে চিন্ময় বুঝল নীহারিকা দেবীর পুত্র ভালই কাজকর্ম করেন। তাঁর স্ত্রীর বয়স হলেও নিজের শরীরকে যথেষ্ট যত্ন রেখেছেন। সে হেসে বলল, 'আপনার বিয়ে হয়েছে কত বছর?'

'অ-নেক দিন।' অদ্ভুতভাবে হাসলেন মহিলা।

'আপনার শাশুড়ির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাননি ?'

'না। উনি তো অনেক আগেই সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছেন।'

'সন্ন্যাসিনী ?'

'মানে, সংসার ত্যাগ করে গিয়েছেন তো !'

'উনি না থাকাতে আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে ?'

'না তো! দেখুন, শাশুড়ি মাথার ওপরে নেই এতে যে কোন বউ খুশি হয়।'

'হুঁ। ওঁর কোন ছবি আছে আপনাদের কাছে ?'

'না।'

'কেন ?'

'দেখুন, ঘরের ব্যাপার, আমি তো এখন এই বাড়িরই, আলোচনা করতে ভাল লাগে না। আপনি বরং ওর কাছে শুনবেন। আমি কিন্তু আপনার ভীষণ ফ্যান। সব বই পড়ে ফেলেছি। আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেননি কেন ?'

'সময় পাইনি।'

'ইস্‌স। মোটেই বিশ্বাস করি না।'

এই সময় এক ভদ্রলোক বাজারের ব্যাগ হাতে দরজায় এলেন। পঞ্চাশের কাছে বয়স। ভদ্রমহিলা তাঁকে দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'এই যে গ্যাখো, উনি এসেছেন।'

চিন্ময় উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই ভদ্রলোক বললেন, 'আরে ঠিক আছে। আপনি স্বনামধন্য মানুষ। এ বাড়িতে এসেছেন, আমাদের সৌভাগ্য।' বাজারের ব্যাগ নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো। কাল মামা ফোন করেছিলেন। আপনি এসবের সঙ্গে কিভাবে জড়িত হলেন ? বসুন।'

'হয়ে গেলাম!' চিন্ময় বসল।

ভদ্রলোক স্ত্রীকে বললেন, 'একটু চা করো।'

ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলে চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, আপনার মাকে মনে পড়ে ?'

'হুম্।' গম্ভীর মুখে সামনে বসলেন ভদ্রলোক, 'এগার বছরের স্মৃতি মনে না থাকার কোন কারণ নেই। যদিও ভুলে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম।'

'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনার মামাও এরকম কথা বলছিলেন ওঁর সম্পর্কে।'

'আগে বলুন আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসেছেন?'

'সবই নিশ্চয়ই শুনেছেন।'

হ্যাঁ। ওঁর টাকায় আমি মোটেই ইন্টারেস্টেড নই।'

'দেখুন, আমরা তিনজন মানুষের নাম পেয়েছি। আপনি, আপনার মামা আর শীতাংশু দত্ত নামে এক অনাত্মীয় ভদ্রলোক। উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনার দাবি সবার আগে। আপনি যদি না নিতে চান তাহলে সেটা লিখে দিতে হবে। আপনার মামাও মনে হল অনাগ্রহী। রইলেন শীতাংশুবাবু।' চিন্ময়কে কথা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন. 'না। খবরদার না।'

'না কেন?'

'ওই লোকটাই তো সব নষ্টের গোড়া।'

'বুঝলাম না।'

'ওর জন্যেই দাদু বাধ্য হয়েছিলেন মাকে বৃন্দাবনে রেখে আসতে। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সেখানে মায়ের মাথা মুড়িয়ে দীক্ষার ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছেন। এসবই ওই লোকটার হাত থেকে মাকে বাঁচাতে।'

'কেন?'

'এসব কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।'

'তাহলে ওই টাকা!'

'মা টাকাটা পেলেন কি করে?'

'কপালগুণে!' হেসে বলল চিন্ময়, 'আপনারা তো খোঁজখবর রাখতেন না। উনি কিভাবে বেঁচে ছিলেন তাও জানতে চাননি কখনও।'

'হ্যাঁ। জানার দরকার আছে বলে মনে করিনি।'

এই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে মহিলা ঘরে এলেন, 'যাই বল, হাজার হোক তুমি ওঁর ছেলে। কবে কখন কি করেছিলেন তা কেন ধরে রাখছ। তুমি টাকাটা নিলে হয়তো ওঁর আত্মা শান্তি পাবে।'

ভদ্রলোক বারংবার হাতের মুঠো খুলছিলেন আর বন্ধ করছিলেন. 'প্লিজ, শীতাংশু দত্ত যেন ওই টাকা না পায়। মায়ের মন ভুলিয়েছিল লোকটা! মাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। উঃ।'

চিন্ময় ভেবে পাচ্ছিল না আর কি বলা যায়। অভিনয় যে অবধি হয়েছে তার বেশি যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু নীহারিকা দেবীর ছেলের কাছে ভাই-এর কাছে পাওয়া খবরের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

চা নিল ওরা। চুমুক দিয়ে চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'শীতাংশুবাবুর সঙ্গে ওঁর আলাপ হল কি করে? মানে ব্যাপারটা কি বেশি বয়সে হয়েছিল?'

এবার মহিলা জবাব দিলেন, 'না। শুনেছি ওঁর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল।'

'কথা হয়নি। উনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, দাদু রাজি হননি। মায়ের বিয়ে হয়ে গেলেও ওদের যোগাযোগ ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর আমি নিজের চোখে দুবার—!' ভদ্রলোক মুখ নামিয়ে নিলেন।

'তখন বিধবা বিবাহ তো অসম্ভব ছিল না।'

'আমরা দুই ভাইবোন যথেষ্ট বড়, সেই অবস্থায় ওই বয়সী মেয়ের বিয়ে হয়?'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে চিন্ময় বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনার স্ত্রী বললেন ওঁর কোন ছবি আপনার কাছে নেই। খুঁজলেও কি পাওয়া যাবে না?'

ভদ্রলোক সামান্য ভাবলেন, 'একটা গ্রুপ ছবি আছে।'

'দেবেন?'

ভদ্রলোক উঠে ভেতরে যেতেই মহিলা বললেন, 'আবার কবে দেখা পাব?'

'দেখি।'

'না না। প্লিজ আর একদিন আসুন। সেদিন এসব কথা হবে না কিন্তু।'

'আপনাদের ছেলেমেয়ে ?'

'এক ছেলে। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ে। সকালে ও অফিসে বেরিয়ে গেলে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত আমি একদম বেকার। কবে আসছেন ?'

'আসব একদিন!'

'আপনি তো যোধপুর পার্কে থাকেন, না ?'

'ওই, কাছেই।' চিন্ময় ভদ্রলোককে ফিরতে দেখে উঠে দাঁড়াল। লাল হয়ে আসা পোস্টকার্ড সাইজের একটা গ্রুপ ফটো। পরিবারের অনেকের সঙ্গে দুটি কিশোর এবং বালিকা আছে। একটু ঝাপসা কিন্তু বোঝা যায়। একটু লক্ষ্য করতেই নীহারিকা দেবীকে চিনতে পারল সে। সুন্দরী, খাটো চেহারার ওই মহিলার সঙ্গে জননী দেবীর কোন মিল নেই। কিন্তু চিবুকের তিলটা স্পষ্ট। ছবি ফিরিয়ে দিল সে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকাটা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে ?'

'এখনই বলতে পারছি না। আমি আপনাদের সমস্ত কথাবার্তা ওঁকে লিখে জানাব।'

'ওঁকে মানে ?'

'নীহারিকা দেবীকে।'

'সেকি ? উনি তো মারা গিয়েছেন!' চমকে উঠলেন ভদ্রলোক

'আমি কিন্তু আপনাদের কখনও বলিনি উনি মারা গিয়েছেন। আচ্ছা, চলি।'

বাড়ীতে ফিরে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল চিন্ময়। মাথায় কিছু আসছে না। এমনিতে গল্প খুব সরল। একটি ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা এমন কাজ করতেই পারে। সেই সময়কার পরিবেশানুযায়ী এমন পরিণতি খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দুটো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। জননী দেবী আর নীহারিকা দেবী যে একই ব্যক্তি তার কোন প্রমাণ সে এখনও পায়নি। চিবুকের কোঁচকানো চামড়ায় যে কালো দাগ রয়েছে

সেটা তিল মাও হতে পারে। তা হলে ? দ্বিতীয়ত, জননী দেবী এখনও তাঁর নিজের কোন পরিচয় প্রকাশ করেননি। যদিও তাঁর এখনকার কথাবার্তা ও আচরণে যৌবনের দিনগুলোর সূত্র খুঁজতে যাওয়া বোকামি। চিন্ময় উঠল। জুতো খুলে দরজায় শব্দ করে জননী দেবীর ঘরে ঢুকতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে মাথার ঘোমটা কপাল পর্যন্ত টেনে দিলেন তিনি।

'আজ শরীর কেমন ?' চিন্ময় খানিকটা দূরে মাটিতেই পা মুড়ে বসল। জননী দেবীর মুখ দেওয়ালের দিকে ফেরানো। তাই পাশ থেকে তাঁর মুখ কাত হতে দেখল।

'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন জ্বর বাধিয়ে। মা, এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

'না'। খুব নিচু স্বরে জবাব এল।

'আপনার জন্যে গোপালের মূর্তি এনে দেব ?'

'না। বৃন্দাবনের যমুনার পাথর আছে।'

'আপনি এখানে আসায় আমার খুব ভাল লাগছে। যদি ইচ্ছে হয় এই ফ্ল্যাটের অন্য ঘরেও আপনি যেতে পারেন। আমি আর ধরণীদা ছাড়া এখানে কেউ নেই। কোন সঙ্কোচ করবেন না তবে একটা কথা, আপনাকে খাওয়া বাড়াতে হবে।'

'পেট শুকিয়ে গিয়েছে বাবা।'

'ঠিক আছে, ধীরে ধীরে বাড়ান। আমি ঠিক করেছি আপনি খাওয়া না বাড়ালে আমি খাওয়া কমাব। তাতে আমার যদি শরীর খারাপ হয় হোক।'

'না। আমার তো চারকালও গিয়েছে, আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কেন ?'

'ও, আমার বয়স কম বলে ভেবেছেন। চল্লিশ পেরিয়ে গেছি অনেকদিন।'

'তা হলে একা কেন ?'

'কপালে লেখা নেই, তাই।' চিন্ময় হাসল। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মনে হচ্ছিল সুস্থ হবার পর জননী দেবী যেন অনেকটাই নিজেকে ফিরে পেয়েছেন। বৃন্দাবনে অথবা এখানে আসার পরেও যে ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন এখন যেন অনেকটা সংযত হয়েছেন। সে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো কলকাতায় আছেন। এখানে আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে না?'

'ক-ল-ক-তা!'

'হ্যাঁ। এই বাড়ি কলকাতার একদম দক্ষিণে। যদি কারো কথা মনে পড়ে আমাকে বলতে পারেন, আমি তাঁদের খবর দেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার জন্যে।'

'না, না!' অস্ফুট প্রতিবাদ করে উঠলেন জননী দেবী।

'ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনি ভাববেন না।' চিন্ময় উঠে পড়ল।

ড্রইং রুমে এসে চিন্ময় দেখল অনাদি মণ্ডল আরাম করে বসে আছেন। তাকে দেখামাত্র তিনি বললেন, 'কাল রাত থেকে মশাই হেভি টেনশনে আছি। চলুন।'

'কোথায়?'

'বাঃ। নীহারিকা দেবীর ছেলের কাছে যেতে হবে না?'

'ঘুরে এসেছি।' চিন্ময় সোফায় বসে সিগারেট ধরাল।

'সেকি। কখন? আমায় বাদ দিয়ে—।' মন খারাপ হয়ে গেল ভদ্রলোকের।

'আপনি যে যাবেন তা বলেননি কাল।'

'হুম্। তা কি বললেন তাঁরা?'

'একই কথা। মামা আর ভাগ্নের মধ্যে বক্তব্যের ফারাক নেই।'

'ও। ডেঞ্জারাস।'

'ডেঞ্জারাস কেন? এটাই তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু এদিকে তো সকাল থেকে শীতাংশু দত্ত তিনবার টেলিফোন করেছেন।'

'কেন?'

'তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'কি ব্যাপার ?'

'সে কথা কিছুতেই বলছেন না।'

চিন্ময় উঠল। অনাদি মণ্ডলের কাছে নম্বরটা জেনে নিয়ে সে টেলিফোনের বোতাম টিপল। কলকাতায় একবারেই লাইন পাওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। ওপারে কেউ একজন সাড়া দিতেই সে নাম্বারটা মিলিয়ে নিয়ে শীতাংশু দত্তকে চাইল। যিনি ধরেছিলেন তিনি পরিচয় জানতে চাইলেন। চিন্ময় বললে, 'বলুন, কাল সন্ধ্যের পর যারা গিয়েছিল তারাই কথা বলতে চায়। উনি নিজেই আজ ফোন করেছিলেন।'

মিনিট চারেক বাদে শীতাংশু দত্তর গলা পাওয়া গেল, 'কে ?'

'আমি চিন্ময়।'

'ও হ্যাঁ। শুনুন, আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

'কেন বলুন তো ?'

'কাল রাত্রে আমার মনে হল আপনি সব কথা বলেননি। কিন্তু আমি প্রায় অশক্ত। একা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে অসুবিধে হয়।'

'তা হলে বৃন্দাবনে যেতেন কি করে ?'

'বলেছিলাম, মন চেয়েছিল। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম এই শরীর আর বশে নেই। আর তখন থেকে ছটফট করছি। এ যে কি যন্ত্রণা—!'

'আপনি কিন্তু এখনও বলেননি কেন দেখা করতে চান ?'

'সেটা সাক্ষাৎ না হলে বলতে পারব না।'

'আমি যদি গাড়ি পাঠিয়ে দিই আপনি আসতে পারবেন ?'

'তা পারি।'

'বেশ। নিজে যেতে প্রথমে চেষ্টা করব। না পারলে গাড়ি পাঠাবো। তবে আমার ড্রাইভার আগামীকাল আসবে। সে এলে ব্যবস্থা করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব।' লাইন ছেড়ে দিল চিন্ময়। হাঁ হয়ে শুনছিলেন অনাদি মণ্ডল, এবার বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো ? ভদ্রলোক প্রায় ঘাটে যাওয়ার আগেও প্রেমিক হয়ে থাকছেন ?'

চিন্ময় বলল, 'বাংলায় প্রবাদ আছে পুরুষ মানুষের প্রবৃত্তি চিতায় উঠেও যায় না। তবে আমি কিন্তু ওঁর মন এখনও প্রেমিক হয়ে আছে বলে ঈর্ষাবোধ করছি। ইটস লভ্। বলুন, আর কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'বুঝতে পেরেছি। উঠি এখন। আপনি লেখা শুরু করে দিয়েছেন?

'দাঁড়ান, শেষ দেখি, তারপর।'

'খুব দেরি হয়ে যাবে না?'

'এত তাড়াতাড়ি মরে যাব বলছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করলেন অনাদি মণ্ডল, 'ছি ছি ছি। স্বপ্নেও ভাবি না মশাই। সত্যি, এমন লজ্জা দেন মাঝে মাঝে। আপনি একাশি বছরের আগে মরবেন না।'

'একাশি? হঠাৎ একাশি কেন?'

'বাঃ, রবীন্দ্রনাথের পরমায়ু!' অনাদি মণ্ডল উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল চিন্ময়, 'না মশাই, ওঁর ক্ষমতার এক ভাগও যখন আমার নেই, তখন তাঁর আয়ু পেতেও চাই না। উনি আরও বেঁচে থাকলে বাঙালির সম্পদ বাড়তো। আমরা তো আগাছা।' চিন্ময় অনাদি মণ্ডলকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

পরের দিন সকাল থেকে লেখা শুরু করেছিল সে। টেলিফোন যা এল ধরণীদা সমানে বলে গেল, 'উনি ব্যস্ত আছেন কথা বলতে পারবেন না।' দরজায় বেল বাজলে খুলে বলে দিয়েছে, 'বাবু বাড়ি নেই।' দুপুর দুটোর সময় আঙুল যখন টনটন করতে লাগল তখন চিন্ময় উঠল। এই রকম টানা লেখা লিখতে যতই কষ্ট হোক লেখার পরে মন খুব ভাল হয়ে যায়। সে স্নান সেরে খাবার টেবিলে এসে বসল। ধরণীদা খাবার দিতে দিতে গজগজ করে গেল, 'এত লোক জ্বালাতন করে যে আমি পারছি না আর।'

'তার তো কোন নিদর্শন দেখছি না। মেনু বেড়েই চলেছে।'

'ওটা আমি করিনি।'

'কে করেছে?' সোজা হয়ে বসল চিন্ময়।

'মা।'

'মা?'

'হ্যাঁ। নিজের জন্যে করেছিলেন। হঠাৎ বললেন, দিতে সাহস হয় না, তবু তুমি একটু চেখে দ্যাখো। নিজের হাতে বাজার করে আনো। তা আমি বললাম, আমাকে দিচ্ছেন, বাবুর জন্যে একটু দেবেন না? বললেন, না বাবা। সাহস হয় না। তাই আমাকে যা দিয়েছিলেন তাই ভাগ করেছি দুজনের মত।'

চিন্ময় তরকারিটা মুখে দিল। একটু চুপ করে রইল। ধরণীদা জিজ্ঞাসা করল, কেমন হয়েছে?'

'তুমি তিন জন্ম চেষ্টা করলেও এত ভাল রান্না করতে পারবে না।'

ধরণীদার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, 'মুখ বদলালে ভাল লাগবেই।'

চিন্ময় হেসে উঠল, 'যাক। ওঁকে বলবে আমার খুব ভাল লেগেছে. এখন থেকে রোজ একটু করে চাই। আরে বাবা তুমি খেয়ে দেখো, তোমারও ভাল লাগবে।'

এত অল্প আয়োজনে এমন চমৎকার তরকারি সত্যি কোনদিন খায়নি চিন্ময়।

ড্রাইভার এসে গেল দেশ থেকে। চিন্ময় ভেবে পাচ্ছিল না শীতাংশু দত্তকে এখানে নিয়ে আসবে কিনা। সে স্থির করল নিজেই যাবে। দুপুরের পর সে গাড়ি নিয়ে চলে এল হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। আজ শীতাংশু দত্তের ঘরে পৌঁছাতে বেগ পেতে হল না।

শীতাংশুবাবু খাটে আধশোয়া ছিলেন। চিন্ময় ঢুকতেই বসতে বললেন। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার শরীর কি খারাপ?'

'হ্যাঁ। আজ সকাল থেকে জ্বর জ্বর লাগছে। পায়েও বেশ ব্যথা। সময় এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আপনি যে এসেছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ।'

'কেন ডেকেছেন আমাকে?' স্মিত মুখে প্রশ্ন করল চিন্ময়।

শীতাংশু দত্ত একটু চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'আমি নীহারিকার সঙ্গে দেখা করতে চাই। মারা যাওয়ার আগে একবার ওকে দেখতে চাই।'

'কিভাবে?'

'জানি না। এত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার কথা নয় আমার। আমাদের বংশে আমার ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন ছিয়াত্তর পর্যন্ত। কিন্তু আমি বেঁচে আছি। আপনার তো আমার কাছে আসার কোন কথা ছিল না। তবু এই বয়সে এলেন। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন কোথায় নীহারিকা আছে। আপনি জানেন না?'

চিন্ময় চুপ করে রইল।

'সত্যি কথা বলতে আপনার অসুবিধে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একজন মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে তা হলে এলেন কেন?'

'আমি জানতাম না আপনার শরীর এত অশক্ত।'

'ও।' শীতাংশু দত্ত মাথা নাড়লেন, 'তা হলে বলুন সে কেমন আছে?'

'ভাল ছিলেন না। কিন্তু এখন চেষ্টা হচ্ছে ভাল রাখার।'

'কি রকম দেখতে হয়েছে?'

'ওঁর বয়স তো আপনি জানেন। এই বয়সে যেমন হয়।'

'হাঁটাচলা করতে পারে তো।'

'পারেন।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অদ্ভুত গলায় জানতে চাইলেন, 'অতীতের কোন কথা কি ওর স্মরণে আছে? মানে, আপনাকে কিছু বলে?'

'না। এখন পর্যন্ত আমি ওঁর অতীতের কোন ঘটনা জানতে পারিনি।'

'কেন?'

'মনে হয় ওঁর স্মৃতিশক্তি ঠিক কাজ করছে না।'

'সেকি।'

'হয়তো নানান ঘাত প্রতিঘাতে এমন হয়েছে।'

'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। সত্যি কথা বলুন।'

'হ্যাঁ। আপনি ভুল বলেননি।'

চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন শীতাংশু দত্ত। চুপচাপ। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর চিন্ময় বলল, 'এবার তাহলে আমি উঠি।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন শীতাংশু, 'আমার সঙ্গে ওর কি দেখা হতে পারে না?'

'দেখুন, এই ভদ্রমহিলা যে সত্যি সেই নীহারিকা দেবী তার কোন প্রমাণ আমি পাইনি এখনও। একমাত্র তিনিই এই রহস্য উদ্ধার করতে পারেন।' চিন্ময় বিনীত গলায় বলল।

'বেশ। ওর পিঠের বাঁ দিকে দেখবেন একটা ক্ষতের দাগ। চিবুকে তিল।'

'চিবুকের তিল চামড়ার ভাঁজে মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পিঠের ক্ষত কিভাবে হল?'

শীতাংশু মাথা নামালেন। একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'শেষ পর্যন্ত নীহারিকা আমার কাছে আসতে চেয়েছিল। সন্তানদের নিয়ে এলে আমি সত্যিই খুশি হতাম, ও তাই চেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে ছেলেমেয়েদের বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ওর ভাই এবং বাবাকে ছেড়ে তারা মায়ের সঙ্গে কখনই আসবে না। মনের সঙ্গে আমাকে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত যখন সে স্থির হয়েছিল তখনই ধরা পড়ে গেল। প্রহৃত হল সে। একটা ধারালো শিক গেঁথে গিয়েছিল পিঠে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই ডাক্তার ডাকতে হয়। তিনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে গেলে পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে বলে অন্য ডাক্তারকে ডেকে বাড়িতেই চিকিৎসা করানো হল। তারপর মোটামুটি সুস্থ হলে ওর বাবা বৃন্দাবনে নিয়ে গেলেন।'

ফেরার পথে গাড়িতে বসে চুপচাপ ভেবে যাচ্ছিল চিন্ময়। নীহারিকা দেবীর কাছে গিয়ে তাঁর পিঠ দেখতে চাওয়া অসম্ভব। শালীনতা ছাড়াতে সে পারবে না। আগে জানা থাকলে অসুখের সময় ডাক্তারকে দিয়ে ওটা পরীক্ষা করা যেত। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেল। শীতাংশু দত্তকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল দেখা হলে তিনি নীহারিকা দেবীকে কি প্রশ্ন করতে চান? এখন যা বয়স ওঁর তাতে উত্তরটা দিতে হয়তো সঙ্কোচবোধ করতেন না।

দরজা খুলল ধরণীদা। খুলে বলল, 'তিনি অনেকক্ষণ এসেছেন।'

'কে?' নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল চিন্ময়।

'ওই যে তিনি। সেদিন এসেছিলেন।'

'কে এসেছিলেন? নাম কি?'

'নাম তো জিজ্ঞাসা করিনি। দিদিমণির সঙ্গে আপনি কত গল্প করলেন।'

'দিদিমণি! কোথায়?'

'মায়ের ঘরে। আধঘণ্টার ওপর গল্প করছেন দুজনে।'

নিজের ঘরে না ঢুকে ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে জননী দেবীর ঘরের দরজায় গিয়ে থমকে গেল সে। দরজাটা আধা ভেজানো। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। একই সঙ্গে দুটো গলা। হাসি থামতেই জননী দেবী বলে উঠলো, 'ও বাবা, কতদিন পরে হাসলাম। বুকে ব্যথা করছে।'

'সেকি? খুব শরীর খারাপ লাগছে আপনার?' গলাটা রাত্রির উদ্বেগ মেশানো।

'না, না। সে ব্যথা নয়।' জননী দেবী নিশ্চিন্ত করলেন।

সরে এল চিন্ময়। এমনভাবে তার সঙ্গে একবারও কথা বলেননি ভদ্রমহিলা। এই স্বরটিও সে প্রথম শুনল। নিজের ঘরে এসে ধরণীদাকে ডাকল সে, 'উনি এখন যেভাবে গল্প করছেন, সেই ভাবে কখনও কথা বলেছেন তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আজই তো দিদিমণি আসার আগে কত গল্প হচ্ছিল।'

'কি গল্প?'

'আমি বললাম, আপনার শরীর ভাল হয়ে গেলে দাদাবাবুকে বলে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মাকে দেখিয়ে আনব। শুনে বললেন সেই ছেলেবেলা থেকে এতবার কালীঘাটে গিয়েও যখন কোন কাজ হয়নি তখন আর যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর।'

'কালীঘাটের মন্দিরে অনেকবার গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কলকাতায় থাকতেন আগে।'

'কলকাতায় কোথায়?' চিন্ময়ের চোয়াল শক্ত হল।

'তা জিজ্ঞাসা করিনি।'

'কর। আমি জানতে চাই কিন্তু একবারও বলবে না আমার কথা।'

ধরণীদা ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেলে মনে হল লিখতে বসা যাক। লেখার টেবিলে কলম নিয়ে বসলে যা হোক কিছু এসে যায়। কিন্তু রাত্রির জন্যে মনটা খিঁচড়ে থাকায় সেই চিন্তা বাতিল করল। রাত্রি কেন এল? এল যদি তবে ওই ঘরে যেতে গেল কেন? আর আশ্চর্য, ওই রকম এক মহিলার সঙ্গে অত হেসে কি কথা বলছে রাত্রি। যে স্তরে ওর চলাফেরা তার থেকে কয়েক যোজন তফাতে বিচরণ করেন বৃদ্ধা! এই দূরত্ব দূর হল কি করে? নাকি এটা ভান, অভিনয়।

এই সময় অনাদি মণ্ডলের টেলিফোন এল, 'কি খবর স্যার? করছেনটা কি?'

'মদ খাচ্ছি।' গম্ভীর গলায় উত্তর দিল চিন্ময়।

'দূর! আপনি মিথ্যে বলছেন।'

'অর্থাৎ মিথ্যেবাদী।'

'না, না, এই কথাটা সত্যি নয়। যারা মদ খেয়ে নিজেদের নষ্ট করে আপনি তাদের দলে নন। যদিও খান সেটা শরীরের বল বাড়াতে। চারটে চিঠি এসেছে। সবাই ক্লেইম করছে ওই সময়ে তাদের মাসী পিসী এবং একজনের মা বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন।'

'আর আমার উৎসাহ নেই।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এদের সঙ্গে কথা বললে আপনি আরও নতুন প্লট পেতেন। যাকে বলে জনগণের উপন্যাস, তাই হয়ে যেত।'

টেলিফোন রেখে দিল চিন্ময়। অনাদি মণ্ডল তাঁর ধান্দা নিয়ে থাকুন। কিন্তু মদ শব্দটি নেহাত খেয়ালে উচ্চারণ করেছিল সে অনাদি মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলার সময়। এখন মনে হল খেলে হয়। নিজেই জল নিয়ে এসে হুইস্কির বোতল নিয়ে বসে গেল শোওয়ার ঘরে। একটা রহস্য উদ্ধার করার মানসিকতা নিয়ে সে জননী দেবীকে কলকাতায় আনেনি। কিন্তু ক্রমশ ব্যাপারটা তাই হয়ে গেল। একজন আত্মহত্যাকামী জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ, ঈশ্বর এবং মানুষ সম্পর্কে আগ্রহহীন এক বৃদ্ধাকে শারীরিক সুস্থ রাখার বাসনা ছাড়া তখন তার মনে কিছু কাজ করেনি। এখন কে নীহারিকা দেবী, তার প্রেমিক শীতাংশু দত্ত, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে ফালতু কেন ভাবছে?

তিন পেগ শেষ করার পর বিছানায় শুয়ে পড়ল চিন্ময়। অতিরিক্ত চিন্তার পরে মদ্যপান করলে শরীর আরাম চায়। এমন সময় দরজায় একটা ছায়া এসে দাঁড়াল।

'তুমি মদ খাচ্ছিলে?' রাত্রির গলা।

চিন্ময় উঠে গেল, 'রাত্রি, এটা আমার বাড়ি। আমার কাছে কেউ এলে তার উচিত অপেক্ষা করা। আমার অনুমতি না নিয়ে অন্দর-মহলে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না।'

রাত্রি চুপ করে রইল। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই রইল।

'আমি কিছু বলেছি!' চিন্ময় গলা তুলল।

'জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছি না।' রাত্রির গলায় নির্লিপ্ত।

'হোয়াই?' চিৎকার করে উঠল চিন্ময়।

'চেঁচিও না। ওই মহিলা তোমার এই চেহারা দেখলে এক মুহূর্তও এখানে থাকবেন না।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল চিন্ময়। নিজের এই উত্তেজনার জন্যে সে লজ্জিত হল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'আমার বাড়িতে আমি

একটা অভ্যেসের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। সেখানে কোন বাইরের লোক এসে তার মত কিছু আচরণ করলে আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।'

'তুমি আমাকে বাইরের লোক বললে চিন্ময়?'

'একজাক্টলি। তুমি তাই।'

'বেশ। দেন, আই অ্যাম সরি।' রাত্রি ঘুরে দাঁড়াল, আমি আসছি।'

চিন্ময় উঠল না। রাত্রি চলে গেলে আবার শুয়ে পড়ল। ঘুম আসছে। অসময়ে বড্ড গাঢ় ঘুম। বালিশ আঁকড়ে ধরল সে। ধরণীদা যখন দরজায় এল তখন সে চৈতন্যের বাইরে।

রাত নটায় ঘুম থেকে ওঠার পরে ধরণীদা বলল, 'সারাদিন উপোস হল, এখন কি খাওয়াদাওয়া হবে?'

ঘড়ি দেখল চিন্ময়। তারপর বলল, 'বাথরুম থেকে আসছি, খাবার বাড়ো, তারপর আমি ক্লাবে যাবো। তুমি শুয়ে পড়।'

খাবার টেবিলে এসে মাথা নামিয়ে খাচ্ছিল সে। হঠাৎ একটা তরকারি মুখে দিয়ে বলল, 'ধরণীদা, এটা তুমি রাঁধোনি। ইয়েস অর নো?'

'কি করে ধরা হল?' ধরণীদা পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'চরিত্রে। চরিত্র বোঝ?' ধরণীদার দিকে তাকাল চিন্ময়। সেই দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে ধরণীদা বিপরীত দিকে তাকাল, 'দেখলেন তো, বাবু ঠিক ধরে ফেলেছেন।'

ঘাড় ঘোরালো চিন্ময়। নিজের ঘরের দরজায় নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছেন জননী দেবী। এই প্রথম তাঁকে ঘরের বাইরে দেখা গেল।

'আপনি? কি হয়েছে?' চিন্ময় অবাক হয়ে গেল।

'কিছু না।' মাথাটা দুবার এপাশ ওপাশ হল।

'এত ভাল রান্না আমি জীবনে খাইনি।' চিন্ময় খাওয়ায় মন দিল।

'শরীর খারাপ ?'

'না তো।'

'সেকি!'

ধরণীদা বলল, 'ওমা, দুপুরে শরীর খারাপ হয়নি ?'

'ও, একটু। বড্ড ঘুম পেয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই খাটুনি যাচ্ছে।'

বুকে নতুন ধরনের ব্যথা অনুভব করল চিন্ময়। জ্ঞান হবার পর কেউ তাকে এ ধরনের কথা বলেনি। গলা রুদ্ধ হয়ে আসছিল। এই সময় শুনল, 'আর একটু দেব ?'

চিন্ময় মাথা নাড়ল। ধরণীদা বলল, 'আমার থেকে দিচ্ছি না, পরে দেখা যাবে।'

কিছুক্ষণ খাওয়ার পর জননী দেবী জিজ্ঞাসা করল, 'সে চলে গেল কেন ?'

'কে ?' চমকে উঠল চিন্ময়।

'যে এসেছিল। আমায় না বলে যাওয়ার মেয়ে সে নয়'

'কি করে বুঝলেন ?'

'আমার শরীরের চামড়া শুধু কুঁকড়ে যায় নি মনেরও বয়স বেড়েছে।'

'আমি জানি না রাত্রি কেন চলে গেল।' সত্যি কথা বলতে পারল না সে।

'কিন্তু আজ রাত্রে আমি ঘুমাতে পারব না।'

'কেন ?'

'মেয়েটা বড্ড ভাল।'

'ভাল যদি হয়ও তার সঙ্গে আপনার ঘুমোবার কি সম্পর্ক ?'

'ও কেন আমার সঙ্গে দেখা না করে গেল।'

'হয়তো কোন কাজ ছিল।'

'বিশ্বাস করি না।' কথাটা বলে ভেতরে চলে গেলেন জননী দেবী।

খাওয়াতে আর তৃপ্তি ছিল না। কোনমতে শেষ করে উঠে পড়ল সে। ধরণীদা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?' সে উত্তর দিল না।

মিনিট পনের প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগল চিন্ময়। ভদ্রমহিলা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তাকে বিশ্বাস করেন না। রাত্রি যদি যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যেত। কি আছে মেয়েটার মধ্যে যাতে মহিলা এমন প্রভাবিত হলেন? কি আছে রাত্রির মধ্যে? চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ালো সে। একসময় রাত্রি মানে অনেক ঢেউ, রাত্রি মানে নিঝুম রাত। নিচে নেমে এসে গাড়ি বের করল সে। তারপর সোজা রাত্রির বাবার বাড়ির দরজায়। তখন দশটা বেজে গিয়েছে। বেল টিপতেই রাত্রির বাবা দরজা খুললেন বেশ বয়স হয়েছে। চশমার কাঁচ পুরু। চিনতে পারলেন না প্রথমে। মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

'আমি চিন্ময়।'

'চিন্ময়? কোন্ চিন্ময়?'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না মেশোমশাই?'

এবার ভদ্রলোক চিনতে পারলেন। রাত্রির বিবাহ-পূর্ব দিনগুলোতে তিনি চিন্ময়কে মোটেই পছন্দ করতেন না। মেয়ের বিয়ে ভাল পাত্রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। চিনতে পারার পর বললেন, 'ও তুমি! এসো। কি ব্যাপার?'

'রাত্রির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'ডেকে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রাত্রি বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অবাক হয়েছে, প্রচণ্ড অবাক হয়েছে। রাত্রিবাসের ওপর চাদর জড়িয়ে নিয়েছে তাড়াতাড়িতে, 'তুমি?'

'বুঝতে পারছি এই সময় আসা অন্যায় হয়েছে, কিন্তু উপায় ছিল না।'

'না, না। বসো। কি হয়েছে বল তো?'

'চেয়ারে বসে চিন্ময় বলল, 'তুমি কি গুণ করেছ জানি না, জননী

দেবী তোমার দর্শন চাইছেন। কোন কথা শুনতে চাইছেন না। এখন যা করবার তুমি করো।'

রাত্রি মুখ নামিয়ে ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বল তো উনি কে?'

'আমি জানি না। বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসেছিলাম।'

'তোমার কোন আত্মীয়া নন?'

'না।'

'আমি খুব লজ্জিত চিন্ময়, না জেনে ওঁকে নিয়ে তোমায় বাজে কথা বলেছিলাম।'

'ঠিক আছে।'

'কিন্তু, তুমি ড্রিঙ্ক করো সেটা কি উনি জানতে পেরেছেন?'

'ধরণীদা সেটা ওঁকে বলবেন না। আর আমার ঘরে ওঁর আসাযাওয়া নেই।'

'আমি যদি এখন তোমার সঙ্গে যাই তা হলে ফিরতে পারব?'

'গাড়ি আছে, যত রাত হোক ফেরার কোন অসুবিধে নেই।'

'তা হলে একটু অপেক্ষা কর আমি চেঞ্জ করে আসি।'

'তোমার বাবা?'

'ওটা আমি বুঝব।' রাত্রি ভেতরে চলে গেল।

গাড়িতে উঠে রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ড্রাইভার নেই?'

'না। রাত্রে বের হবার কথা না থাকলে ছেড়ে দিই।'

'তা হলে আমাকে পৌঁছে দেবে কে?'

'যে নিয়ে যাচ্ছে সে।'

হঠাৎ চুপ করে গেল রাত্রি। রাত্রের নিস্তব্ধ কলকাতার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ ফেরালো, 'তুমি হঠাৎ এত পাল্টে গেলে।'

'হঠাৎ মানে?'

'সেদিন আর আজ যে ভাষায় এবং ভঙ্গিতে কথা বললে তার সঙ্গে এখন কোন মিল নেই।'

চিন্ময় জবাব দিল না। নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল। রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'এই বৃদ্ধা মহিলার ওপর তোমার এমন দুর্বলতা হল কেন?'

'হল। হয়ে গেল!'

'ভদ্রমহিলার কোন আত্মীয়স্বজন নেই?'

'জানি না। এখনও জানতে পারিনি।'

'তুমি কি কোন এক্সপেরিমেন্ট করছ।

'এত প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দিই কি করে!' চিন্ময় হাসল।

ওরা পৌঁছে গেল তাড়াতাড়ি। লিফটে নিজের তলায় চলে এসে বেল টিপতেই ধরণীদা দরজা খুলল, 'যাক বাবা, আপনি এসে গেছেন। আমাকে আর মিথ্যেবাদী হতে হল না। আমি ওঁকে একটু আগে বলেছি আপনি এখনই আসবেন।'

রাত্রি তৎক্ষণাৎ ভেতরে চলে গেল। চিন্ময় সঙ্গী হল না। বৃদ্ধা যা বলার তা ওকেই বলুন। ধরণীদা বলল, 'অনাদিবাবু ফোন করেছিলেন। খুব জরুরী। আর তিনজন ফোন করেছিল। দুজন পাবলিশার আর একজন পত্রিকা থেকে।'

'এত রাতে?'

'কি জানি।' ধরণীদা ভেতরে চলে গেলে চিন্ময় ফোনে অনাদিকে ধরল। অনাদি মণ্ডল উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কাণ্ড হয়েছে মশাই। এক ভদ্রলোক, গোটা পঞ্চাশেক বয়স, ফোনে ক্লেইম করছেন এই মহিলা তাঁর মা। উনি নাকি অনেক খুঁজেছেন পাগলের মত। বললেন, মুখের বাঁ দিকে তিল ছিল। আর সব বর্ণনাও মিলে যাচ্ছে। আমি ওঁকে কাল আসতে বলেছি। কখন নিয়ে যাব?'

'কেন?' খুব নিচু গলায় জানতে চাইল চিন্ময়।

'আরে, জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না? আর একটা গল্পের প্লট। অবশ্য এখন বেশ নাটক জমেছে। কার মা? এঁর, না সেই নীহারিকা দেবীর ছেলের? ইনি হয় নীহারিকা দেবী নয় এর মা, স্বর্ণলতা দেবী। উঃ, আরও কেউ যদি কোন গল্প নিয়ে আসেন তা হলে পাবলিক যা যাবে না!'

'আর কিছু বলার আছে অনাদিবাবু ?'

'না স্যার। কখন যাব শুধু এটুকু।'

'আমার দরকার নেই কাউকে, আপনি অলওয়েজ ওয়েলকাম। আফটার অল আমার অন্নদাতা বলে কথা!'

'ছি ছি ছি! লজ্জা দেবেন না। আপনার দৌলতেই করে খাচ্ছি। কিন্তু।'

লাইন কেটে দিল চিন্ময়। না, আর ধৈর্য নেই তার। ব্যাপারটা যেভাবে শুরু হয়েছিল তা থেকে অনেক জটিল হয়ে যাচ্ছে। সত্যি যদি ইনি নীহারিকা বা স্বর্ণলতা দেবী হন তা হলে কি এসে যাবে। যদি ইনি তাঁদের চিনতে পেরে ফিরে যেতে চান তবেই ব্যাপারটার সমাধান হবে। না চাইলে ? আর সেইটে না চাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এখন রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। রাত্রি জননী দেবীর ঘর থেকে বের হচ্ছে না। বেশি রাত হলে তারই মুশকিল। চুপচাপ সোফায় বসেছিল সে। ধরণীদা এসে জিজ্ঞাসা করে গেছে রাত্রের খাবার দেবে কি না। উল্টে বকুনি খেয়েছে। এগারটা চল্লিশ নাগাদ রাত্রি এল বাইরের ঘরে, 'তুমি এখানে বসে আছ ? খাওয়াদাওয়া করে নাও ?'

'নাঃ। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে ওসব হবে। কি বলছেন উনি ?'

'আমায় বিদায় করলে স্বস্তি পাবে ?'

'এ কথা এখন ভাবতে পারছি না।'

'আমার বোধ হয় আজ রাত্রে যাওয়া হবে না।' রাত্রি এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। চিন্ময়ের দিকে না তাকিয়ে টেলিফোন তুলল রাত্রি। তিনবার বোতাম টিপল। চতুর্থবারে সাড়া পেয়ে কথা বলল, 'বাবা, চিন্ময়ের বাড়ি থেকে বলছি। এখানে একজন বৃদ্ধা মহিলা বেশ অসুস্থ। আমাকে থাকতে বলছেন। যদি উনি ঘুমিয়ে পড়েন তা হলে আমি যাব।'

ওপাশের কথা শুনে রাত্রি বলল, 'দাঁড়াও জিজ্ঞাসা করছি। বাবা বেশি রাত্রে যেতে নিষেধ করছেন। ইফ আই স্টে ব্যাক তোমার

আপত্তি আছে ?' এই প্রশ্ন চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে করা তাই সে নীরবে ঘাড় নেড়ে না বলল।

'ঠিক আছে। বাবা, তুমি চিন্তা করো না।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রাত্রি বলল, 'চল, খেতে বসবে। অনেক রাত হয়েছে।'

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'ওঘরে কি অবস্থা ?'

'গোঁ ধরেছিলেন আমি না এলে খাবেন না। দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন সকালে এলে ? আমার যে সবসময় তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।'

'তুমি কি বললে ?'

'বললাম আমি এ বাড়িতে থাকি না। আপনার গোপাল চায় না আমি হুটহাট এখানে আসি। আপনি এমন করবেন না, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব।'

'তারপর ?'

'উনি গুম হয়ে গেলেন। গায়ে হাত বোলাতে গিয়ে দেখি বেশ জ্বর। ধরণীদাকে দিয়ে থার্মোমিটার আনিয়ে দেখলাম একশ দুই পয়েন্ট চার। সামান্য কিছু খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। কাল সকালেও যদি জ্বর থাকে ডাক্তার ডাকতে হবে।'

'আবার জ্বর এসেছে ! স্ট্রেঞ্জ ! উনি এই জ্বর থেকে উঠলেন।'

'হয়তো উদ্বেগ থেকে। জানি না।'

'এখনই ডাক্তার ডাকব ?'

'মনে হয় দরকার নেই। কারণ অন্য কোন কমপ্লিকেশন আছে বলে মনে হল না। এর আগেরবার তোমার ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছিল তার কয়েকটা পড়ে আছে। যদি রাত্রে জ্বর বাড়ে তাহলে আধখানা দেওয়া যেতে পারে।'

'অদ্ভুত।'

'মানে ?,

'তোমাকে বলছি। এর আগে যেদিন এলে সেদিন আমার বাড়িতে মহিলা আছে বলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলে আজ দেখছি সম্পূর্ণ অন্য

চেহারা। আমেরিকায় এতদিন থেকেও তোমার বাঙালিয়ানা যায়নি। তুমি খাবে তো?'

'না। আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তুমি যাওয়ার আগেই।'

খাওয়ার টেবিলে চলে এল চিন্ময়। এসে ধরণীদাকে বলল, 'ওঁর জ্বর হয়েছে সে কথা আমাকে বলা প্রয়োজন বলে মনে করোনি?'

'কি করব? দিদিমণি যে বলতে নিষেধ করলেন!' ধরণীদা মাথা নিচু করল।

উল্টোদিকে বসে চিন্ময়ের খাওয়া দেখল রাত্রি। তারপর ধরণীদাকে বলল, 'আমাকে দুটো চাদর আর একটা বালিশ দেবে?'

'কি হবে? ওপাশের ঘরে বিছানা পাতাই আছে, শুয়ে পড় ওখানে।'

'আমি ওঁর কাছে শোব।'

'ওঁর কাছে?' অবাক হয়ে গেল চিন্ময়, 'উনি আলাউ করবেন?'

'মনে হয় আপত্তি করবেন না।'

'কিন্তু শোবে কোথায়? ওঁর ঘরে তো একটাই খাট!'

'মাটিতে শোওয়া যাবে।'

'পাগল। ঠাণ্ডা লেগে একটা কাণ্ড হবে।'

'কিছু হবে না, তুমি এ নিয়ে চিন্তা করবে না তো।' হাসল রাত্রি। ধরণীদা তখন রান্নাঘরের দিকে গিয়েছে। রাত্রি সেই হাসি নিয়েই বলল, 'ওঁর ঘরে আমি নিরাপদ।'

'কি থেকে?' চমকে উঠল চিন্ময়। রাত্রি আবার হাসল, জবাব দিল না।

চিন্ময় চুপচাপ বেসিনে মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে চলে এল। তার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে রাত্রিকে দেখে বলল, 'রাত বেশি হয়নি, উনি ঘুমিয়ে পড়লে তোমার চলে যাওয়াই ভাল রাত্রি।'

'রাগ করেছ?' রাত্রি হাসল, 'তুমি আগের মতই আছ। এত নাম, অবস্থা এত ভাল তবু চরিত্র একটুও পাল্টায়নি। থ্যাঙ্কস।'

'তুমি আমাকে কি ভাবো বল তো? সুযোগ পেয়েই একজন বিবাহিতা মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? অ্যাম আই দ্যাট বিস্ট?'

হঠাৎ নীল হয়ে গেল রাত্রি। বাঁ হাত বাড়িয়ে দরজার পাল্লা আঁকড়ে ধরল সে। শব্দ হতেই মুখ ফেরাল চিন্ময়, 'কি হল?'

'কিছু না।' বলে কোনমতে ফিরে গেল সে ভেতরে। নিজের বলা কথাগুলো তখন নতুন করে কানে বাজল চিন্ময়ের। আপাতভাবে সে কোনরকম ভুল কথা বলেনি। তবে কি রাত্রি নিজেকে বিবাহিতা বলে আর ভাবতে চায় না? গোলমালে পড়ল সে এবং একটু একটু করে খারাপ লাগতে লাগল।

মিনিট দশেক বাদে সে জননী দেবীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে ভেতর থেকে। সে দরজায় চাপ দিতে ওটা খুলে গেল। খাটের ওপর বসে আছেন জননী দেবী, দরজার দিকে পেছন-ফেরা। তাঁর কোলের কাছে মুখ রেখে রাত্রি ফোঁপাচ্ছে। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। সেই রাত্রি, আধুনিকা, আমেরিকায় বাস করা প্রায় মেমসাহেব মেয়ে নামগোত্রহীন বৃন্দাবনের যমুনার ঘাট থেকে নিয়ে আসা এক বৃদ্ধার কাছে বসে কাঁদছে? হায় জীবন? চিন্ময় সরে এল। কি শিখেছে এতদিন? জীবনকে কোন মাপে মাপবেন কবি সাহিত্যিক? কোন হিসেব নেই।

নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল এখন। রাত্রি জননী দেবীর কাছে যে সান্ত্বনা পাচ্ছে তা দেবার বদলে সে আঘাত দিয়েছে অজান্তে। দরজার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় ধরণীদা জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলার আছে?'

চট করে মনে পড়ে গেল শীতাংশু দত্তের কথা। ইশারায় নিজের ঘরে ধরণীদাকে আসতে বলে সে পা চালালো। তারপর একটি কাগজে লিখল, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অকপটে। একটা অনুরোধ, জননী দেবীর পিঠে একটি ক্ষতের দাগ থাকতে পারে। অনেক পুরনো। সেটি আছে কিনা দেখার সুযোগ পেতে পারো?' লেখা হয়ে গেলে কাগজটা ধরণীদাকে দিয়ে বলল, দরজায় শব্দ করে মিনিট পাঁচেক বাদে ঢুকবে। এই কাগজটা মাকে লুকিয়ে দিদিমণির হাতে দেবে। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নেড়ে কাগজ নিয়ে চলে গেল ধরণীদা।

রাত বেশ। শুয়ে পড়ল চিন্ময়। মিনিট তিনেক বাদেই বুঝল আজ সহজে ঘুম আসবে না। চোখ বন্ধ করেও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ঘুমের ওষুধ বাড়িতে নেই। সেই অভ্যেস এখনও করেনি সে। টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডাক্তারকে ধরল। এত রাত্রের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে জননী দেবীর জ্বরের কথা বলল। সব শুনে ডাক্তার বলল, যদি কাল সকালেও জ্বর থাকে তা হলে চিন্ময় যেন তাকে জানায়। আগের ওষুধটা প্রয়োজনে দেওয়া যেতে পারে। যাক, একটা চিন্তা দূর হল। চিন্ময়ের মনে পড়ল, অনেক অনেক দিন কারো জন্যে রাতদুপুরে উদ্বেগ নিয়ে ডাক্তারকে ফোন করেনি সে।

শেষ পর্যন্ত হুইস্কির বোতলটা নিয়ে বসল। ঠাণ্ডা জলে একটা পাতিয়ালা পেগ ঢেলে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল। দিয়েই মনে হল হুইস্কি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। প্রচুর ক্যালোরি ঢুকছে শরীরে। এর আগে একবার ইসিজি করিয়েছিল সে। তখন ডাক্তার বলেছিল, সিগারেট ছাড়ুন, ইচ্ছে হলে রোজ রাত্রে দু পেগ ভাল হুইস্কি খেতে পারেন। শরীরের উপকার হবে।

এখন এসব খাওয়ার সময় এটাকেই সে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করায়। খেতে খেতে তার মাথা থেকে জননী দেবী, রাত্রি উধাও হয়ে গেল। তার কেবলই মনে হতে লাগল আজ অবধি কিছুই লেখা হয়নি। নাম অর্থ সবই হয়েছে কিন্তু আসল কাজটাই হয়নি। এখন বাংলা সাহিত্যে সবাই একই লেখা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখছে। ফর্মের পরিবর্তন যে সব লেখকরা করতে চাইছেন তাঁদের পাঠক গ্রহণ করছেন না। অর্থাৎ তাঁরা ঠিকঠাক কাজটা করতে পারছেন না। অথচ এই পরিবর্তন হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে ফর্মে উপন্যাস লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র তা লেখেননি। রবীন্দ্রনাথও না। কল্লোল কালিকলমের লেখকরা শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ থেকে উপন্যাসের ফর্ম পাল্টে নিয়েছিলেন। বলার ধরণটাই বদলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে সেই একই গাড়ি চলছে। বিষয়ের সঙ্গে ফর্ম পাল্টায়। বিষয়টাই যেহেতু পাল্টাচ্ছে না তো ফর্ম পাল্টাবে কি করে? অথচ জীবন পাল্টে গিয়েছে। তিরিশ

থেকে সত্তরের দশকের জীবনের মধ্যে আঠারো-বিশ পার্থক্য ছিল। এখন প্রায় দশ-বিশ। সেই জীবনকে উপন্যাসে ধরছে না তারা। পাঠক পড়েন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে না। নতুন প্রজন্ম যদি তাদের জীবন আজকের উপন্যাসে না পায় তা হলে আগ্রহী হবে না। ঔপন্যাসিক ব্যাক ডেটেড হয়ে যাবেন। এই জীবন এবং তার চরিত্র ধরতে হবে একদম অন্য ধরনের লেখায়। সেই লেখাটা সে কবে লিখতে পারবে? ক্রমশ একটা যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছিল চিন্ময়। তৃতীয় গ্লাস শেষ হতেও এক ধরনের বিষন্ন ভাবনা থেকে সে মুক্তি পাচ্ছিল না।

এই সময় রাত্রি এসে দাঁড়াল। থমথমে মুখ।

'তুমি, এই ঘরে?' চিন্ময় গলার স্বর সংযত রাখছিল।

'বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আর তুমি ড্রিঙ্ক করছ?'

'আমার কিছুই করার নেই।'

'যদি ডাক্তার ডাকতে হয়, যদি নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হয়?'

'তুমি আছ।'

'আশ্চর্য আর মদ খাবে না।'

'ভয় নেই আমি মাতাল হব না।' আর একটা পেগ নিল চিন্ময়।

'যা ইচ্ছে তাই করো।'

'না।'

'আমার কাগজটা পেয়েছ?'

'হুঁ। ওইভাবে চাইলেই কোন মহিলার পিঠ দেখা যায়?'

'সুযোগ পেলে দেখো।'

'কেন দেখতে বলছ?'

'যদি ওঁর পিঠে চিহ্ন থাকে তা হলে ওঁর নাম নীহারিকা দেবী।'

'যদি উনি নীহারিকা দেবী হন তা হলে কি করবে?'

'কি আর করব? কিছুই না।'

'তা হলে জানতে চাওয়া কেন?'

'ওহো, হলে শীতাংশু দত্তকে নিয়ে আসব। ওই ভদ্রলোক এখনও

নীহারিকা দেবীকে খুব ভালবাসেন। একসময় ওঁদের ভালবাসা ছিল।'

'একসময় ভালবাসা থাকলে এখন যে সেটা বেঁচে থাকবে এমন কে বলেছে?'

'হ্যাঁ, নাও থাকতে পারে।' গ্লাসে চুমুক দিল চিন্ময়।

'তুমি আমাকে কখনও ভালবাসতে?'

'অফকোর্স। বাসতাম।'

'এখনও বাসো?'

চিন্ময় জবাব দিল না। আঙুলে গ্লাস ঘোরাতে লাগল।

'জবাব দাও।' হঠাৎ রাত্রির মুখ শক্ত হয়ে গেল, 'একটু আগে বললে তুমি পশু নও যে একজন বিবাহিতা মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি এখনও আমাকে একজন বিবাহিতা মহিলা বলে দূরত্ব রেখেছ। তা হলে বিয়ে করনি কেন?'

'মধ্যরাত্রে নাটক করো না। ইট্‌স মাই প্রব্লেম। আমি যদি কাউকে ভালবাসি তা হলে তার দেওয়া সব সুখ দুঃখ আমি একা বইব। যেহেতু আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করিনি তাই তোমাকে কৈফিয়ত দিতেও চাই না।'

মাথা নাড়ল রাত্রি, 'শোন, এখনই এই মুহূর্তে যদি বাড়িতে ফিরে যেতে পারতাম তবে স্বস্তি হত। এত রাত্রে একা যাওয়া যায় না, তোমার মত মাতালের সাহায্য নিতেও রুচিতে বাধছে। তার ওপরে, ওই বৃদ্ধা অসহায়া মহিলা কেন জানি না আমাকে জড়িয়ে ফেলেছেন একটা দিনে। গুড নাইট।' সোজা দরজার দিকে গেল রাত্রি।

চিন্ময় ডাকল, 'শোন।'

রাত্রি দাঁড়াল না। চিন্ময় উঠতে গিয়ে চেয়ারে ধাক্কা খেল। শব্দ করে পড়ে গেল চেয়ারটা। তৎক্ষণাৎ বিস্মিত রাত্রি ফিরে এল। চেয়ারটা তোলার চেষ্টা না করে চিন্ময় বলল, 'পড়ে গেল। ইচ্ছে করে ফেলিনি।'

রাত্রি ঘরে ঢুকে চেয়ারটাকে তুলল। চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আমেরিকা থেকে এখানে ফিরে এলে কেন?'

'জবাব দেবার প্রয়োজন আর নেই।'

'পনের বছর স্বামীর ঘর করেছ তখন আমায় মনে পড়েনি?'

'না।'

'ও। আমার কথা একটুও ভাবোনি?'

'কেন ভাবব? আমার স্বামী যা দিয়েছেন তাতেই তৃপ্ত ছিলাম।

শ্লেষ মেশানো বাক্যগুলো শুনতে শুনতে প্রচণ্ড তেতে যাচ্ছিল চিন্ময়। সে বলেই ফেলল, 'ও। তাই উনি চলে যেতে মনে হল আমার খবর নেওয়া দরকার?'

'তাই। তুমি এত বুদ্ধিমান আমার জানা ছিল না। জেনে ভাল লাগছে।' রাত্রি চলে গেল জননী দেবীর ঘরে। বোতল থেকে কিছুটা আবার গ্লাসে ঢালল চিন্ময়। হঠাৎ নিজেকে একদম ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছিল তার। জেদ এবং ঝোঁকের মাথায় সে খেয়ে যাচ্ছিল একটার পর একটা। হঠাৎ দরজায় ধরণীদা এসে দাঁড়াল, 'দাদাবাবু, এবার শুয়ে পড়ুন।'

'শাট আপ্।' চিৎকার করে উঠল চিন্ময়, 'নিজের কাজ করোগে। তুমি এখনও জেগে আছ কেন? ঘুমোতে পারোনি? যাও।' সরে গেল ধরণীদা। চিন্ময় উঠল। তার পা টলছিল। দুটো পা দিয়েই সোজা হতে চাইল। এত মদ অনেকদিন খাওয়া হয়নি। ভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনেটা মাঝে মাঝেই ঝাপসা। এবার শুয়ে পড়লেই হয়। বিছানায় শুলেই অথৈ ঘুম। কিন্তু জননী দেবী? তাঁর কি আবার জ্বর এলো? একবার দেখে তবে শোওয়া উচিত। হঠাৎ কর্তব্যবোধ যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

চিন্ময় সাবধানে পা ফেলে ঘরের বাইরে এল। তার মনে হচ্ছিল সে ঠিকঠাক যাচ্ছে। কিন্তু শরীর নিজের পথ তৈরি করে নিচ্ছিল। ওইভাবে সে ডাইনিং স্পেস পেরিয়ে জননী দেবীর ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাত্রির গলা ভেসে এল, 'দাঁড়াও।'

হকচকিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সে অনেকটা জায়গা নিয়ে টাল সামলালো। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে চলে এল রাত্রি, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'ওঘরে। তুমি এখানে ?'

'ওঘরে যেতে হবে না। ঘরে চল।

'ঘরে ? কেন ? আমি কি মাতাল হয়ে গিয়েছি ?'

'কি হয়েছ জানি না। ঘরে চল।' ডান হাতে চিন্ময়কে জড়িয়ে সাবধানে ঘরমুখো হল রাত্রি। আর সেই টানে কোন প্রতিরোধ তৈরি করতে পারল না চিন্ময়। হঠাৎ সব ছাপিয়ে একটা সুবাস এল তার নাকে। হাঁটতে হাঁটতে, রাত্রির শরীরে ভর রেখে সে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে রাত্রি। আমি খুব টায়ার্ড।'

তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। ঘরে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি গায়ে চাদর দাও না ?'

'না।' হঠাৎ একবার চেতনা স্পষ্ট হল চিন্ময়ের, 'তুমি ওখানে বসেছিলে কেন ?'

'এমনি।' রাত্রি চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, 'ওঁর পিঠে কোন দাগ নেই।'

'নেই ? একটা, একটা, কি চিহ্ন. হ্যাঁ ক্ষতচিহ্ন ?'

'না। চামড়া কুঁচকে এত ফেটে গেছে যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'যাচ্চলে!'

'মানে ?'

'তা হলে ওই লোকটা এত ভালবাসা নিয়ে কি করবে ?'

রাত্রি জবাব দিল না।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?'

'সব কিছুর জন্যে মানুষ অনেকটা সময় পায় চিন্ময়। সেই সময়ে যদি সে অন্ধ হয়ে বসে থাকে তা হলে পরে হাতড়ে মরলেও কিছু কি পাওয়া যায় ?

'ঠিক। ঠিক কথা। তা হলে ইনি স্বর্ণলতা দেবী। নির্ঘাৎ।'

'যদি প্রমাণ হয় ইনি তাও নন।'

'তা হলে ইনি কে ?' বিড়বিড় করল চিন্ময়।

'ধরে নাও ইনি আমার ভবিষ্যৎ। সব দাগ, সমস্ত ক্ষত একসময় এসে গ্রাস করে নেবে। তখন সব কিছু একাকার।'

'রাত্রি।' চেঁচিয়ে উঠেই মুখে হাত দিল চিন্ময়, 'সরি! জননী দেবীর ঘুম ভেঙে যাবে।'

'না, ভাঙবে না।'

'কেন? ভাঙবে না কেন?'

'কারণ উনি নেই। তোমার ঘর থেকে ফিরে দেখলাম—।'

হঠাৎ গলা থেকে একটা জান্তব শব্দ ছিটকে বের হল। শরীরের প্রতিটি শিরা উপছে এক ঝড় যেন আচমকা আঘাত করল বুকের পাঁজরে। শেষ পর্যন্ত হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল সে। হঠাৎ হঠাৎই, মদের নেশা ছাপিয়ে অন্যতর বোধ প্রবলতর হল। নিজেকে একদম নিঃস্ব পরাজিত বলে মনে হতে লাগল তার। হু হু করে চলে যাচ্ছিল নেশা। রাত্রি জিজ্ঞাসা করল, 'এত কাঁদছ কেন?'

'আমি, আমি, ওঁকে জীবন দিতে চেয়েছিলাম। উনি যমুনার ধারে মরতে চেয়েছিলেন। আমার সমস্ত অহঙ্কার চুরমার করে দিলেন উনি।'

'তাহলে তুমি অহঙ্কার হারানোর শোকে কাঁদছ?'

'না। আমি ওঁকে মা বলেছিলাম।'

'তাহলে এখনও তোমার প্রাণে ভালবাসা আছে চিন্ময়?'

'আমার লেখায় তুমি নেই, কোথাও নেই, না? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যে ভ্যাখে সেই ভ্যাখে। তুমি অন্ধ, তাই আমাকে বুঝতে পারোনি।' বিছানায় উপুড় হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল চিন্ময়। পায়ে পায়ে কাছে এসে পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল রাত্রি। এবং ওর পিঠে মুখ রেখে সেও কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ বাদে রাত্রি ফিসফিস করে বলল, 'আমরা কি নতুন করে শুরু করতে পারি না? গত পনের বছরের কোন ব্যাখ্যা না চেয়ে আমরা কি আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারি না।

'আমি যদি আবার হেরে যাই।' চিন্ময় বড় করে নিঃশ্বাস নিল।

'হারবো না। ওঠো।' প্রায় জোর করে তাকে তুলল রাত্রি। আঁচলে চোখ মুখ মুছিয়ে দিল যত্ন করে। তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে এল জননী দেবীর ঘরে। দরজা পেরিয়ে এক পা ঢুকতেই জননী দেবী হাসলেন, 'এসো গোপাল, কাছে এসো বসো।'

চিন্ময় চমকে রাত্রির দিকে তাকাল। রাত্রি মুখ নামাল। জননী দেবী বললেন, 'না, ওকে বকবে না। আমি জানতে চেয়েছিলাম তুমি ওকে ভালবাসো কিনা। আমি যা বলেছি ও তাই করেছে। সব কথা বলেছে আমাকে। গোপাল, আমার কাছে এসো।'

চিন্ময় গিয়ে খাটে বসল। তার মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন মহিলা, 'আমার রাই বলেছে তুমি নাকি আমার অতীত খুঁজতে চেষ্টা করেছ। কি লাভ? অতীত কখনও বর্তমানে ফিরে আসে? অতীত ভুলে যাও, আমার, রাইয়েরও। বরং আমাকে এই রাই-গোপালের সঙ্গ পেতে দাও। ওই দ্যাখো রাই-এর হাত দিয়ে আমি যমুনার পাথর পর্যন্ত ফেলে দিয়েছি।'

চিন্ময় দেখল ধরণীদার কেনা কাঠের আসন শূন্য। হাত বোলাতে বোলাতে জননী দেবী বললেন, 'তোমায় আর নতুন কি বলব গোপাল, জীবন বড় নিষ্ঠুর, কষ্ট করে সুখী হতে হয় গো। সেই সুখে তো কোন দাগ থাকে না। ও আমার সোনার গোপাল, এমন রাই পেয়ে তুমি যদি সুখী না হও তো কে হবে?'

মৃগয়া

এই কাহিনীর নায়কের নাম হরিমাধব। জ্ঞান হবার পর এমন একটা নাম বহন করতে তার প্রবল আপত্তি ছিল। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সহপাঠীদের রসিকতার বিষয় হয়েছিল তার নাম। পরিপাটি সুন্দর নতুন ধরনের নামাবলী শুনতে শুনতে হরিমাধবের মন কুঁকড়ে থাকত। কিন্তু এদেশে বার্থসার্টিফিকেট দেখিয়ে স্কুলে ভর্তি হবার নিয়ম চালু হবার পর ঠাকুমার প্রদত্ত এই সাইনবোর্ড আর খুলে ফেলতে পারেনি সে। মাঝে ভেবেছিল এফিডেবিট করবে, কিন্তু তাতে উৎসাহ পায়নি!

নায়ক হরিমাধব এখন রয়েছে লণ্ডন শহরে। তার বয়স উনত্রিশ। চেহারা লম্বা কিন্তু ঈষৎ রোগা, দাড়ি সুন্দর করে কামানো। হরিমাধব নায়কের মত চুল রাখে, যত্ন নেয়। সে উঠেছে স্ট্র্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল হোটেলে। নামটি যদিও ভারি কিন্তু হোটেলটি সেই জাতের কুলীন নয়। কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলের ভাল হোটেলগুলোর সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। তাকে প্রতিদিন পনের পাউণ্ড দিতে হবে ঘর ভাড়ার জন্যে। ঘরটি একজনের পক্ষে ভাল, তিনতলায় রাস্তার ধারে। কমন বাথরুম হলেও বন্দোবস্তে আধুনিক ছাপ আছে। খেতে হচ্ছে বাইরে। এখন এক পাউণ্ডের দাম ভারতীয় টাকায় প্রায় সাতাশ। অর্থাৎ চারশো পাঁচ টাকা ছাড়া খেতে সোওয়াশো বেরিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে পাঁচশো তিরিশ টাকা দিনে খরচ করার ক্ষমতা উচ্চবিত্ত বাঙালির থাকে না। যদিও গত তুদিন হরিমাধব প্রায় খায়নি বললেই চলে। তার জ্বর হয়েছিল। ধুম জ্বর। এই তুদিন কেউ তার খোঁজ করেনি। একমাত্র যে মেয়েটি রোজ বিছানা পাল্টাতে আসে সে খুব সমব্যথা দেখিয়েছিল। ওষুধ লাগবে কিনা জানতে চেয়েছিল। ছেলেবেলায়

ওদের বাড়ির কাজের মেয়ে ননীবালা জ্বর হলে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকত। সেটা দেখা থাকায় হরিমাধব ওষুধ খায়নি। যেখানে এক প্যাকেট ভাল সিগারেটের দাম চুয়ান্ন টাকা সেখানে ওষুধের দাম কত হবে কে জানে! মেয়েটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ঠাণ্ডা হাত। হোক ঘর পরিষ্কারওয়ালি তবু খুব ভাল লেগেছিল। এই প্রথম কোন মেমসাহেব তার শরীরে হাত ছোঁয়াল।

হরিমাধব কেন লণ্ডনে এল, তার জীবিকা কি এ নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। হরিমাধবের তেমন কোন গুণ নেই। সে সাহিত্যিক, গায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিশেষজ্ঞ নয়। অর্থাৎ যে সমস্ত গুণাবলী থাকলে ভারতীয়রা অন্যের পয়সায় বিদেশে যেতে পারেন তার কোনটাই হরিমাধবের নেই। সে কলকাতার একটি সওদাগরি অফিসে করণিকের চাকরি করে। সাকুল্যে মাইনে পায় বাইশশো পঞ্চাশ টাকা। সওদাগরি অফিসের মালিকের ভারি পছন্দের লোক সে। কারণ ইংরেজি ভাষায় হরিমাধবের চমৎকার দখল আছে। চিঠি লেখা এবং ইংরেজি বলার ব্যাপারে সে অফিসের প্রতিনিধিত্ব করে। সে বিয়ে থা করেনি। কারণ এই টাকায় কলকাতা শহরে সুন্দরভাবে স্ত্রীকে নিয়ে থাকা যায় না বলে তার বিশ্বাস। সে তাদের বারোয়ারি বাড়িতেই একা থাকে, দিনেরবেলায় অফিস করে, সন্ধ্যেবেলায় নাটক-থিয়েটার দ্যাখে, মাঝে মাঝে তিন পেগ মদ্যপান করে। বছর পাঁচেক ধরে তার কিছু সময় যাচ্ছে রেস নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে। রেস সে খেলে না কিন্তু ঘোড়া এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ে রীতিমত চর্চা করে যাচ্ছে সে। রেস সংক্রান্ত প্রচুর বইপত্র তার পড়া হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। ঘোড়ার গতি, তার ওপর চাপানো ওজন থেকে আরম্ভ করে দূরত্ব, সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে যেসব ফর্মুলা আছে, তাও তার জানা। এইসব সমীক্ষা নিয়ে নানান অঙ্ক কষে সে দেখেছে প্র্যাকটিস এবং থিওরির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। এইসব জ্ঞানের ওপর ভরসা করে রেসে ঘোড়া নির্বাচন করে দ্যাখে দশটির মধ্যে বেশি হলে পাঁচটি জিতে যায়। আর পাঁচটির মধ্যে দুটি লড়ে হারে কিন্তু তিনটি ঘোড়ার আচরণের সঙ্গে হিসেবের কোন মিল

থাকে না। হরিমাধব একটি দৈনিক কাগজে রেসের ওপর লেখে। আগাম নির্বাচন করে। সেগুলো ছাপা হয় নিয়মিত। এই কাজের জন্যে সে মাসে চারশো টাকা পায়।

এই হরিমাধবের লণ্ডনে আসার কোন কথা ছিল না। সম্ভাবনা দূরের কথা সে কখনও স্বপ্নও দ্যাখেনি। অথচ সে লণ্ডনে আছে ঠিক দশদিন। প্রথম দুদিন শহরটার হাল বুঝতেই কেটেছিল। তারপরের পাঁচদিন পাগলের মত ছোটাছুটি করেছে। শেষ দুদিন জ্বর। মাস খানেক আগে তার কোম্পানির মালিক শাওন রায় গুপ্তা তাকে ডেকে বলেন, 'হরিবাবু, আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। বহুৎ জরুরি।'

হরিমাধব বলেছিল, 'হুকুম করুন, নিশ্চয়ই করব।'

'আপনাকে একটু লণ্ডনে যেতে হবে?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না হরিমাধব, 'কোথায়?'

'লণ্ডন, ইংলণ্ড। আপনি ছবিটবি কালই আনুন, পাসপোর্ট-ভিসা সব তিন উইকের মধ্যে হয়ে যাবে। সেসব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। প্লেনভাড়া ছাড়া আপনাকে ছয়শো পাউণ্ড দেব। তিনশো এখানে এফ টি এস থেকে বাকি তিনশো লণ্ডনে আমার এক ফ্রেণ্ড দেবে। আপনি ওই টাকায় আট-নয়দিন থেকে কাজটা করে দিন।'

পাউণ্ড, এফ টি এস শব্দগুলো কানের পর্দায় ঝনঝন করছিল। হরিমাধব শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু কাজটা কি এখনও বলেননি!'

'আমার প্রাইভেট লাইফে একটা প্রবলেম হয়েছে। ইট্‌স বিটুইন ইউ এ্যাণ্ড মি। আর কেউ জানুক আমি চাই না। আমার মেয়ে লণ্ডনে পড়তে গিয়েছিল। স্কুল পাশ করলেই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যাতে ইংরেজি শিখে আসে ভাল করে। এমন নসীব সে আর এদেশে ফিরতেই চাইছে না। আমার ওয়াইফ বহুৎ আপসেট। লণ্ডনে আমার ফ্রেণ্ড্‌স আছে। তাদের কাছে শুনেছি মেয়ের মতিগতি ভাল না। চার-পাঁচজন বয়ফ্রেণ্ড আছে। পয়সা ওড়াচ্ছে কিন্তু পড়াশুনাও

ভি করছে। আমার সন্দেহ ও কারো প্রেমে পড়েছে। আপনি গিয়ে ওই প্রেমটাকে এমনভাবে কাটিয়ে দিন যাতে সে দেশে ফিরে আসে।'

'কী করে করব?'

'ডোণ্ট আস্ক মি কোশ্চেন। কী করে করবেন তা আপনার হেডেক আমি যদি কলকাতা থেকে যাই তাহলে বিজনেসে বহুৎ লস হয়ে যাবে তাই আপনি যান। কাজ হয়ে গেলে আপনাকে খুশি করে দেব।'

অতএব হরিমাধব একটি বেপরোয়া মেয়েকে টাইট করতে লণ্ডনে এসেছিল। পাঁচদিন ছুটোছুটি করে সে অনেক তথ্য জোগাড় করেছে মেয়েটির সম্পর্কে কিন্তু তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। সকালে গিয়ে দেখেছে বাড়ি বন্ধ, দুপুরে কেউ নেই, সন্ধের পরেও অন্ধকার মেয়েটি যেখানে যেখানে যেতে পারে তার সবকটা জায়গায় ঢুঁ মেরেছে সে কিন্তু একবার এক পলকের জন্যে দেখতে পাওয়া ছাড়া কোন কাজ এগোয়নি।

মেয়েটা যেন বুঝতে পেরেছে তার পেছনে লোক লেগেছে। সেই লোককে কাটাবার সবরকম কায়দা সে রপ্ত করেছে। বিদেশে এসে কারো বাড়ির সামনে মধ্যরাত পর্যন্ত থাকা যায় না দাঁড়িয়ে তাছাড়া রাস্তাঘাট, এলাকাও এত তাড়াতাড়ি সড়গড় হয়নি তার মেয়েটার ছবি দিয়েছিলেন মালিক। সুন্দর চেহারা। কিন্তু এক পলক চোখে দেখেছিল তাতে মনে হয়েছিল সিনেমার উগ্র নায়িকারাও হার মেনে যাবে। যেমন লম্বা সুন্দর শরীর, তেমন তার গ্ল্যামার। ওই বাবার এই মেয়ে ভাবতেই পারা যায় না।

ফেরার টিকিট ওপেন আছে। হিসেব মত তার যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এখন পকেটে আজকের হোটেলের চার্জ মিটিয়ে মাত্র চল্লিশ পাউণ্ড থাকবে। দুদিন খেতে হয়নি বলেই এটুকু বেঁচেছে। এয়ারপোর্টে যাওয়ার খরচ সরিয়ে রাখলে তিরিশের বেশি আর থাকবে না মালিকের পরিচিত লোকটি তাকে আসার পরই পাউণ্ড দিয়েছিল এবং তার কাছে যে দ্বিতীয়বার যাওয়া যাবে না তা বুঝিয়ে দিতে ইতস্তত করেনি। এই অবস্থায় আজকের দিনটায় যা হোক একটা

ফয়সালা করতেই হবে। মেয়েটাকে ধরে বলতে হবে সব কথা। সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেল। কি কথা বলবে। এতদিনে যার দেখাই পেল না তাকে একদিনে ধরে কি বোঝাতে পারে।

পরিষ্কার হয়ে হরিমাধব বুঝল সে ক্ষুধার্ত। এই হোটেলের ডাইনিং রুমে সকাল নটা পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয় বিনা পয়সায় বোর্ডারদের। নিচে নেমে সেটা খেয়ে হাতে ম্যাপ নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রোদ ওঠেনি একদম। মেঘলা ছায়া জড়িয়ে আছে লণ্ডনের শরীরে। এই ক'দিন সে একটাও বাংলা শব্দ বলেনি। খোঁজ করলে লণ্ডনে অন্তত এক গণ্ডা আত্মীয় বন্ধু বের হত। কোন কাজ না করে দেশে ফিরে গেলে মালিকের সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। হয়তো এতদিনের চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হবে।

দুদিনের জ্বর তাকে একটু কাহিল করেছে। ম্যাপ দেখে বাসের নম্বর আর একবার যাচাই করে নিয়ে সে রওনা হল। বিদেশে এসে প্রথম দু'তিন দিন চমক ছিল। এক পা বাড়াবার আগে ইতস্তত করত। কিন্তু ক্রমশ রাস্তাঘাটে এশিয়দের দেখে দেখে সেই সঙ্কোচ কেটে গেছে অনেকটা।

বাস থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে ডান হাতের গলি ধরল হরিমাধব। এদিকটায় লোকজন তেমন পথে নেই। বড় বড় বাড়িগুলোর চেহারা ঠিক ইংরেজি ছবির মত। সাত নম্বর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে এক বৃদ্ধা ইংরেজের দেখা পেল সে। মহিলা একটা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই দরজায় অন্তত দশবার এসেছে সে। বেল টিপল সে। তিনবার। কেউ দরজা খুলছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে হরিমাধব দেখল সেই বৃদ্ধা একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে হাসার চেষ্টা করল।

এবার বৃদ্ধা বললেন, 'যাকে খুঁজছ সে কি ঘরের ভেতরে আছে?'

'নেই? আপনি দেখেছেন বেরিয়ে যেতে?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা, 'আমি অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দ করি না।'

কী বলবে বুঝতে পারল না হরিমাধব। ইনি তো নিজেই আগ বাড়িয়ে কথা বলেছেন।

সে বলল, 'দেখুন, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি। শুধু এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আজ দিন দশেক হয়ে গেল ওর দেখাই পাচ্ছি না। আপনি যদি অনুগ্রহ করে সাহায্য করেন।'

'তুমি কি ওর এক্স বয়ফ্রেণ্ড?'

'বয়ফ্রেণ্ড? না, না। আমি ওর বাবার অফিসে কাজ করি।'

'দেন ইউ আর লাকি।'

'কেন?'

'প্রতিমাসে ওকে আমি অন্তত চারবার বয়ফ্রেণ্ড পাল্টাতে দেখেছি। ও কখনও কারো সঙ্গে স্টেডি থাকতে পারে না।'

বৃদ্ধা আফশোসে মাথা দোলালেন।

'আচ্ছা! কিন্তু আমি কী করে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কাল মাঝরাত্রে ওর গলা পেয়েছিলাম। মাঝরাত পর্যন্ত তো তুমি এখানে থাকতে পারবে না। গেট বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তায় অপেক্ষা করতে পার। অবশ্য যদি পুলিশ সেটা এ্যালাউ করে।'

বৃদ্ধা নিচে নামতে লাগলেন।

হয়ে গেল! চাকরিটা আর থাকল না। কী দরকার ছিল এমন একটা কাজ নিয়ে লণ্ডনে আসার। বাঙালির ছেলে বিলেতে যাওয়ার সুযোগ পেলে এত উন্মাদ হয়ে যায়! নিজেকে এখন ছিবড়ে বলে মনে হচ্ছে। কাল সকালেই এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। পকেটে যা পাউণ্ড আছে তাতে পরশু এখানে থাকা যাবে না।

বিষণ্ণ হরিমাধব সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে দেখল সেই বৃদ্ধা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে তিনি ইশারায় কাছে ডাকলেন, 'তোমাকে দেখে আমার মন খারাপ লাগল। ছাখো কাল রাত্রে ও যখন ফিরেছিল

তখন একজন বন্ধু সঙ্গে ছিল। সে চলে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলেছিল ও আজ দুপুরে রেসকোর্সে অপেক্ষা করবে।'

'রেসকোর্স?' হকচকিয়ে গেল হরিমাধব।

'ইয়েস। এপসম। তুমি ওখানে গিয়ে খোঁজ করতে পার।'

বৃদ্ধা চলে গেলেন।

ঠোঁট কামড়ালো হরিমাধব। লণ্ডনে এসে রেসের ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছে। কলকাতায় থাকতে জীবনে সে মাত্র তিনদিন রেসের মাঠে গিয়েছিল। একটা পয়সাও খেলেনি। ফিরে আসার সময় হিসেব করে দেখেছিল প্রতিটি বাজিতে দশটাকা করে খেললেও পঞ্চাশ টাকা হার হয়ে যেত। ভারতবর্ষে ঘোড়ার রেস চালু করেছিল ব্রিটিশরা। আটটি শহরে বিশাল জায়গা নিয়ে দারুণ-দারুণ রেসকোর্স করে রেখে গিয়েছে ওরা। সেই ইংরেজদের নিজের দেশের রেসকোর্স দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে মেয়েটিকে খোঁজে গেলে। কিন্তু এপসম কোথায়?

রাস্তায় নেমে সে এক নিরীহ মানুষ বেছে নিল, 'আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন এপসম কোথায়? আমি এই শহরে নতুন, সেখানে যেতে চাই।'

লোকটি গম্ভীর মুখে মুখে বলল, 'ওয়াটার্লু স্টেশনে চলে যান। সেখান থেকে ট্রেন পাবেন।'

ব্যাপারটা খটমটো মনে হল। রেসকোর্স হয় শহরের মধ্যে। দিল্লী কলকাতা, বোম্বেতেও তাই। তাহলে এই লোকটা তাকে স্টেশনে যেতে বলল কেন?

কয়েক পা হাঁটতেই একটি ইণ্ডিয়ান শপ চোখে পড়ল। একটু ইতস্তত করে সে ভেতরে ঢুকে গেল। কাউন্টারে পেছনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে গুজরাটি বলে মনে হল। মোটা'সোটা লোকটা গলায় বলল, 'ইয়েস!'

হরিমাধব বলল, 'আই অ্যাম অ্যান ইণ্ডিয়ান।'

'জী! বলিয়ে!'

'আচ্ছা, এপসম রেসকোর্সে যেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?'

'রেসকোর্স ? লোকটির চোখ ছোট হল, রেস খেলতে চান ?'

'না। আমি সেখানে যেতে চাই।'

'ইটস ফার অফ। তার চেয়ে আপনি বেটিং সেন্টারে চলে যান। প্রত্যেক রাস্তায় একটা দুটো অফকোর্স বেটিং সেন্টার পেয়ে যাবেন।'

'সেটা আবার কী ?'

'লণ্ডনে একসঙ্গে তিন চারটে রেস হয়। রেসকোর্সে না গিয়ে একটি বেটিং সেন্টার থেকেই তিনটে রেসকোর্সের রেসে বেট করতে পারেন।'

হরিমাধব মাথা নাড়ল, 'আমি বেট করব না। কিন্তু রেসকোর্সে যেতে চাই।'

লোকটি বলল, 'ও। তাহলে ওখান থেকে বাস ধরে ওয়াটার্লু চলে যান। ওয়াটার্লু স্টেশন থেকে ট্রেন পাবেন।' ভদ্রলোক এমনভাবে বললেন যেন আর কথা বাড়াতে চান না।

রাস্তায় নেমে এল হরিমাধব।

আধ ঘণ্টা পরে টেমস নদী পেরিয়ে সে যেখানে পৌঁছাল, সেখান থেকে ওয়াটার্লু স্টেশন দেখা যাচ্ছে। লণ্ডনে এসে অবধি এদিকে আসার প্রয়োজন পড়েনি। পাতাল রেলে কয়েকবার চেপেছে। ওয়াটার্লু স্টেশনে ঢুকে বুঝতে পারল এটি যাকে বলে পুরো দস্তুর রেলওয়ে স্টেশন। প্রায় ভ্যাবাচাকা খাওয়ার মত অবস্থা। অনেকগুলো টিকিট কাউন্টার, প্রচুর লোক, এলাহি ব্যাপার। এত বিশাল জায়গা নিয়ে স্টেশন সে কখনও আগে ছাখেনি। একদিকের দেওয়ালে কখন কোন ট্রেন কত নম্বর প্লাটফর্ম থেকে কী কী স্টেশন ছুঁয়ে যাবে তা বিভিন্ন বোর্ডে ফুটে উঠছে। পাঁচমিনিট ধরে বোর্ডগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে সে এপসম শব্দটি দেখতে পেল।

কাউন্টারে টিকিট কাটতে গিয়ে শুনল যাতায়াত ভাড়া পাঁচ পাউণ্ড। কিছু করার নেই। আগামীকাল সকালের ট্যাক্সি ভাড়া যদি না থাকে টিউবেই নাহয় এয়ারপোর্ট যাবে। কিন্তু একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে মেয়েটিকে ধরার।

লম্বা প্ল্যাটফর্মে সাত কামরার ট্রেন। তার পাঁচটির গায়ে লেখা আছে নো-স্মোকিং। সিগারেট খাওয়া যায় এমন একটি কামরায় উঠে মনে হল হল কলকাতার কোন ভাল হোটেলে ঢুকেছে। কার্পেট পাতা ঝকঝকে কামরা। খালি সিটে বসেই মনে হল ভারতবর্ষের ট্রেনের এ সি কামরাগুলোও এত আরামদায়ক নয়। অথচ সে সাধারণ ক্লাশে টিকিট কেটেছে। কামরায় যাত্রীর সংখ্যা দশজনের বেশি নয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা কথা বলছে না। তিনজন কালো চামড়ার, যাদের নিগ্রো বলতেই এদেশে সে অভ্যস্ত। লণ্ডনে এসে এদের সংখ্যার প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়েছে। এই নিগ্রোদের আচরণে বোঝাই যায় না তারা বিদেশে আছে। ওরা তিনটি আসনে বসে চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছিল। বাকি যাত্রীরা গম্ভীর মুখের ইংরেজ। খুব অসন্তুষ্ট হলে মানুষের যে মুখ হয়, তা যেন ওরা ধার করেছে।

ট্রেন ছাড়ল। হু হু করে লণ্ডন শহর ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ট্রেন। হঠাৎ হরিমাধবের মনে হল ট্রেনে ওঠার আগে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিলে হত এই ট্রেন এপসম যায় কিনা। বোর্ডে দেখার সময় তার ভুলও হতে পারে। কিন্তু কামরার অন্য যাত্রীদের নির্লিপ্ত অবস্থা দেখে সে সাহস পাচ্ছিল না কথা বলতে। এইসময় ট্রেন গতি কমিয়ে একটি স্টেশনে থামল। সে লক্ষ্য করল যাত্রীরা এই কামরা বাদ দিয়ে অন্য কামরায় উঠেছে। অর্থাৎ এদের সিগারেটের ধোঁয়ায় আপত্তি আছে। ট্রেন ছাড়ল। এখনও লণ্ডনের উপকণ্ঠেই তারা আছে বলে মনে হচ্ছিল ঘর বাড়ি দেখে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বালিগঞ্জ বা সল্টলেকের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। এটা করিডোর ট্রেন। সম্ভবত সমস্ত ট্রেনেই চলন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়ানো যায়।

হরিমাধব সিগারেট ধরালো। এখনও দেশ থেকে আনা তার নিজস্ব ব্র্যাণ্ড শেষ হয়নি। হঠাৎ দেখতে পেল সামনের কামরা থেকে দরজা টেনে এক মহিলা এই কামরায় এলেন। তাঁকে দেখে তার চোখ স্থির। মহিলা লম্বায় ফিট পাঁচ এবং ইঞ্চি ছয়েক হবেন। সরু কোমর, জিনসের প্যান্টের ওপর জ্যাকেট পরা সত্ত্বেও শরীরের বাহার, মুখের

গড়ন এবং চামড়ার রঙের সঙ্গে মেলানো কান পর্যন্ত ছাঁটা চুল যে দ্যুতি ছড়াচ্ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত অভিনেত্রী বাংলা ফিল্মে সুচিত্রা সেন ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউ আসেননি। হরিমাধব দেখল মহিলা প্রায় মাঝখানে চলে গিয়ে তার সমান্তরাল অন্যপাশের জানলায় গিয়ে বসলেন। মহিলার হাতে ঈষৎ ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ। বসেই সেটা টেনে চেন খুললেন। চোখ সরাতে পারছিল না হরিমাধব। মহিলা সেটা একবার লক্ষ্য করলেন। অতএব হরিমাধব ইংল্যাণ্ডের প্রকৃতি দেখার চেষ্টা করল। শহর ছাড়িয়েছে ট্রেন। বাইরে এখন সবুজ মাঠ, চাষের ক্ষেত। আহা, কী সুন্দর। ওপাশে খট্‌খট্‌ আওয়াজ হচ্ছে। হরিমাধব চোখের কোনে তাকাল। মহিলার ঠোঁটে সিগারেট চাপা। ডান হাতের রঙিন বুড়ো আঙুলে তিনি ক্রমাগত লাইটারে চাপ দিয়ে চলেছেন। সেটি ফুলকি তুলছে কিন্তু আগুন বুকে নিচ্ছে না। এমন অভিজ্ঞতা কলকাতায় হয়। কিন্তু লণ্ডনেও যে তার চেহারা দেখা যাবে ভাবতে পারছিল না। এইসময় তার কী করা উচিত? সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে কুকুর কোলে নিয়ে বসে থাকা এক সুন্দরীকে দেখে আলাপ করতে ইচ্ছুক অনিল চ্যাটার্জি ক্যামেরা বাগিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কুকুরের ছবি তুলতে পারি?' ওরকম স্মার্ট হতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছিল না। মহিলা রাগত ভঙ্গিতে লাইটার ব্যাগে ফেলে দিয়ে এপাশ ওপাশে তাকাতে দ্বিতীয়বার চারচক্ষুর মিলন হল। খুব ভদ্রভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কাছে কি লাইটার আছে?' ইংরেজি একটু জড়ানো।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে উঠে দাঁড়াবার আগেই ভদ্রমহিলা আসন পরিবর্তন করে সামনে এসে বসলেন। হরিমাধব ভারতীয় ঘরাণার ইংরেজি উচ্চারণে বলল, 'আপনি ইচ্ছে হলে এই দেশলাইটা ব্যবহার করতে পারেন'

আঙুলে আঙুল ঠেকল। দেশলাইটা নিয়ে মহিলা এমন মুখ করলেন যেন আজব জিনিস তিনি কখনও দ্যাখেননি। উল্টে পাল্টে লেখা পড়ে মুখ তুললেন, 'এটা ইণ্ডিয়ান তৈরি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রমহিলা দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'ইট্‌স গুড। আমি এর আগে কখনও ইণ্ডিয়ান দেশলাই অথবা সিগারেট ব্যবহার করিনি। ইণ্ডিয়ান সিগারেট খুব কড়া?'

'কড়া সিগারেট নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আমার ব্র্যাণ্ডটা কড়া নয়।' হরিমাধব তার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে দেখাল। ভদ্রমহিলা হাত বাড়ালেন, 'এটা বড় সিগারেট নয়। আমি যদি একটা টেস্ট করি তাহলে আপনি কি কিছু মনে করবেন। আপনিও ইচ্ছে করলে আমার সিগারেট খেতে পারেন।'

হরিমাধব হাসল, 'না, না, আমি তো খাচ্ছি।'

মহিলা ততক্ষণ সদ্য ধরানো নিজের সিগারেটটি হাতলের মধ্যে সাঁটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে নিভিয়ে ফেলে হরিমাধবের সিগারেট বের করেছেন। হরিমাধব ওঁর হাত থেকে দেশলাই ফিরিয়ে নিয়ে যত্ন করে দু'হাতের আড়ালে কাঠির আগুন বাঁচিয়ে ওঁর সিগারেট ধরিয়ে দিল। একটা টান আলতো করে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন মহিলা। তারপরেরটা বেশ জোরে। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বিউটিফুল। খুব ভাল সিগারেট।'

'প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন।'

'সেকি? আপনার সিগারেট—।'

'আমার কাছে আরও প্যাকেট আছে।'

'তাই বলে আপনার জিনিস—।' মহিলা কিন্তু কিন্তু করছিলেন।

'ওসব ভাববেন না। আপনাকে সামান্য উপহার দিতে পেরে আমার ভাল লাগছে।'

'ওমা, আপনি আমাকে উপহার দেবেন কেন, আপনি তো আমাকে চেনেন না।'

জীবনে প্রথমবার চরম স্মার্ট হল হরিমাধব, 'ঈশ্বর যাঁকে এমন যত্ন করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে চিনতে কি কোন অসুবিধে হয়?'

ভদ্রমহিলা হেসে গড়িয়ে পড়লেন। হাসি থামলে বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি কবিতা গল্প লেখেন। নইলে এত ভাল কথা বললেন কী করে?'

হরিমাধবের কষ্ট হল। সে কিছুই করেনি এতদিন। কবি বা লেখক এ জীবনে হতে পারবে না।

সিগারেটে টান দিতে দিতে মহিলা বললেন, 'আমি লিজা।'

'আমি হরিমাধব।'

'হ্যারি?' মহিলার চোখ ছোট হল।

এই এক মুশকিল। লণ্ডনে এসে তিনজনকে নিজের নাম বলতে তারা তাকে 'হ্যারি' বলে ডেকেছিল। হরি আর হ্যারিতে আর তফাৎ কোথায়? সে মাথা নাড়ল।

'আপনি কি লণ্ডনে থাকেন?'

'না, বেড়াতে এসেছি।'

'ইণ্ডিয়ান বিজনেসম্যান?'

'না, না। ওই আর কি?'

ততক্ষণ সিগারেট বেশ ছোট হয়ে এসেছে লিজার। সেটি নিভিয়ে ফেলে দ্বিতীয়টি বের করল প্যাকেট থেকে। অবাক হয়ে হরিমাধব জিজ্ঞাসা করল, আপনি আবার খাবেন?'

'হ্যাঁ। আমি দিনে তিনবার খাই। পরপর দুটো।'

আবার সিগারেট ধরিয়ে দিল হরিমাধব। লিজা বলল, 'এরকম খেলে অন্তত পাঁচ ঘণ্টা সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয় না। নেশা কমানোর এটা ভাল রাস্তা।'

'এখানে তো সবাই সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছে।'

'সবাই একশ বছর বাঁচতে চায়। তা যাচ্ছেন কোথায়?'

'এপসম।'

'রেসকোর্সে?'

'হ্যাঁ।'

'আরে ভালই হল। আজকের প্রিন্সেস কাপে কোন ঘোড়া জিতবে বলুন তো?'

হরিমাধব থতমত হল। সে কিছুই জানে না। লিজা বলল, 'আমি খবর পেয়েছি সি কুইন জিতবে। চান্স কিরকম মনে হয়?'

খুব সপ্রতিভ গলায় বলল হরিমাধব, 'ফিফটি ফিফটি।'

লিজা আবার ব্যাগ খুলল। একটা রেসের বই বের করে ঘড়ি দেখল, 'আমার আর একটু আগে বেরুনো উচিত ছিল। প্রথম বাজিটা আমরা পাব না।'

সে বই মুড়ে ফেলতেই হরিমাধব হাত বাড়াল, 'আপনার বইটা একটু দেখতে পারি?'

'অফ কোর্স!'

রেসের বইটি কলকাতার মত নয়। লম্বা, প্রচুর লেখা। প্রতিটি বাজিতে দশ-বারোটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। তাদের ওজন পাউণ্ডে লেখা। পাশে জকির নাম। এদের কয়েকজনকে চিনতে পারল সে। শীতকালে কলকাতায় এরা ঘোড়া চালাতে প্রতি বছর যায়। রেসের রেজাল্ট দেখল পেছনে ছাপা আছে। হঠাৎ মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল তার। এত-দিন রেস নিয়ে সে যে গবেষণা কলকাতায় করেছে তা লণ্ডনে খাটবে না কেন? এখানে পাউণ্ড আর ওখানে কিলোগ্রাম। দুই পাউণ্ডকে এক কেজিতে বদলি করে কলকাতায় যে থিওরিতে হিসেব করে সেইভাবে করলে কিরকম হয়? প্রথমেই সেই প্রিন্সেস কাপের বাজিটি বের করল হরিমাধব। দশটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। প্রথম টিপ সি-কুইন। পরিচিত অভ্যাসে সে হিসেব করতে লাগল। সি-কুইন নিশ্চয়ই ভাল কিন্তু তার চেয়ে কম সময় করে ছুটতে পারে ঈগলহাই। একবার মুখ তুলে সে লিজাকে দেখল। সিটে হেলান দিয়ে লিজা চোখ বন্ধ করেছে। চলন্ত ট্রেনের দুলুনিতে একটা জাদু আছে। সুন্দরী মহিলার ঘুমন্ত মুখ না রেসেই বই? যে কখনও এক পয়সা রেস না খেলে রেস নিয়ে গবেষণা করেছে কলকাতায় লণ্ডনে সে এই অবস্থায় সুন্দরীকে প্রাধান্য দিতে পারে না। পর পর আট বাজির হিসেব সে করে গেল। প্রথম বাজিতে পৌঁছাতে পারবে না বলে দেখল না। আটটা বাজির মধ্যে চারটে বাজি সে বুঝতে পারল না। তিনটে ঘোড়ার সময় এক সেকেণ্ডের পাঁচের এক দুই ভাগ ফারাক হচ্ছে। যে কেউ জিততে পারে। কিন্তু বাকি চারটে বাজিতে যে চারটে ঘোড়া বেস্ট টাইমার হচ্ছে তাদের দুজন তো

আজ হারতেই পারে না। সব দেখে শুনে ওই চারটে ঘোড়ার নাম নম্বর আর বাজির সংখ্যাটা সে একটা কাগজে লিখে রাখল। কোন স্টেশনে ট্রেন থামার আগে মাইকে কলকাতার পাতাল রেলের মত নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। হঠাৎ এপসম শব্দটি শুনতে পেল সে। বই নামিয়ে রেখে সে বাইরে তাকাল। চাষের মাঠ নয়, সবুজ বন আর বন পেরিয়ে ট্রেন ছুটছে। ঘড়ি দেখল হরিমাধব। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গিয়েছেএর মধ্যে। লিজা চোখ মেলল তখনই। বই ফেরত দিয়ে ধন্যবাদ দিল হরিমাধব। লিজা বলল, 'দ্বিতীয় বাজিতে কোন ঘোড়া খেলবেন ? কোন ধারণা আছে ?'

'দেখুন, আমি প্রথমবার যাচ্ছি। তবে গতকাল স্বপ্নে আমি চারটে ঘোড়ার নাম পেয়েছি। সেইজন্যেই যাচ্ছি আর কি ?' চমৎকার মিথ্যে কথা বলল হরিমাধব।

'স্বপ্নে ? স্বপ্নে আপনি ঘোড়ার নাম পেয়েছেন ?' লিজা হতভম্ব !

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল হরিমাধব।

'যেমন ?'

'দ্বিতীয় বাজিতে তিন নম্বর ঘোড়া লাভলি।'

সঙ্গে সঙ্গে বই খুলে বাজিটা দেখতে দেখতেই ট্রেন থামল। চটপট নামতে হল। প্লাটফর্মে নেমে হরিমাধব দেখল ট্রেন খালি করে অনেকেই দৌড়াচ্ছে গেটের দিকে। যেতে যেতে লিজা বলল, 'লাভলি জিততেই পারে না। ওর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়া ওই বাজিতে আছে '

গেটে টিকিট পাঞ্চ করিয়ে সেটা আবার ফেরত নিয়ে ওরা বাইরে এল। একেবারে নির্জন এলাকা। দূরে কয়েকটা সুন্দর বাড়ি। স্টেশনের বাইরে দুটো ডাবল ডেকার বাস দাঁড়িয়ে। তারই একটাতে লিজার সঙ্গে উঠে বসল সে। টিকিট কেটে উঠতে হল। লিজা নিজেরটাই কাটল। পাশাপাশি বসে হরিমাধব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখান থেকে রেসকোর্স কত দূরে ?'

'মিনিট কুড়ি লাগবে।' লিজা আবার রেসের বই দেখছিল। বাস চলেছে প্রায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। মিনিট কুড়ি বাদে তারা যেখানে থামল

সেখানে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। একটা স্টেডিয়ামের মত বাড়িকে ঘিরে গাড়িগুলো পার্ক করা। টিকিট পাঁচ পাউণ্ড। গেট পেরিয়ে লিজা ঘুরে দাঁড়াল, 'লুক হ্যারি, তুমি বিদেশী, তোমাকে তাই বলছি স্বপ্নের ঘোড়াকে বাস্তবে খেলতে যেও না। স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্ন। আলাপ করে ভাল লাগল। সিগারেটের জন্য ধন্যবাদ। বাই।' সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে গেল লিজা। এখন যে তার সঙ্গ চায় না তা বুঝতে অসুবিধে হল না হরিমাধবের। সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ওপরে উঠতেই গ্যালারি, বেটিং সেণ্টার আর রেসকোর্স নজরে এল। ভিড় আছে কিন্তু গিজগিজে নয়। আগে কাজ পরে অন্য কিছু। মেয়েটির ছবি সে পকেট থেকে বের করল। একবার দেখলেই চিনতে পারবে। রেসকোর্সে মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। প্রতিটি দর্শককে সে খুঁটিয়ে দেখবে। গ্যালারির একটা দিক থেকে শুরু করল হরিমাধব। মাঝে রেস্টুরেণ্ট এণ্ড বারও আছে। এই সময় মাইকে ঘোষণা হল রেস শুরু হতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বাজি। সে উদগ্রীব হয়ে তাকাল। মাঠের বিপরীত দিকে ঘোড়াগুলো খাঁচায় ঢুকল। ছয়শো ফার্লং ছুটবে ওরা। রেস শুরু হল। রিলে হচ্ছে। লাভলি নামটা কানে এল। দ্বিতীয় স্থান নিয়ে ছুটছে। বাঁক ঘুরল। প্রথম ঘোড়ার পাশাপাশি লাভলি। এক ফার্লং বাকি থাকতেই লাভলি লিড নিল। এবং জিতে গেল। হিসেব করার সময় এমনটাই মনে হয়েছিল তার। মনে মনে খুব খুশি হল হরিমাধব। লাভলির দর এক পাউণ্ড। রেস সে খেলে না কিন্তু হিসেব মিলে গেল যখন তখন মেয়েটিকে সে নিশ্চয়ই পাবে।

আর্দ্ধেক রেসকোর্স ঘোরা হয়ে গেল। এর মধ্যে দু'জন ভারতীয় মেয়েকে সে দেখতে পেয়েছে। তারা কেউ বাঙালি নয়। তৃতীয় বাজি হয়ে গেল। এই বাজিতে কোন হিসেব করতে পারেনি সে। হঠাৎ তার খেয়াল হল যে চারটে ঘোড়া সে নির্বাচন করেছিল তাদের তিনটের এখনও দৌড়াতে বাকি আছে। ওই তিনটে পরপর তিন রেসে ছিল। কলকাতায় যাকে ট্রিপল টোট বলে অর্থাৎ তিনটে রেসের তিনটে উইনার ঘোড়ার নাম ভবিষ্যৎবাণী করে একটা টিকিট কাটলে অনেক

টাকা পাওয়া যায়। সেরকম এখানে একটা কাটলে কিরকম হয়। টিকিটের দাম পাঁচ পাউণ্ড। বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তিনটে ঘোড়ার নম্বর বলে সে টিকিটটা কাটল। অর্থাৎ পাঁচ পাউণ্ড কমে গেল তার সঞ্চয় থেকে। একজন রেসপণ্ডিত লিখেছেন কোন ঘোড়াই যে নিশ্চিত জিতবে তা কেউ বলতে পারে না। জেতা ঘোড়ার পা উইনিং পোস্ট পার হবার আগে মচকে যেতে পারে। মাঝপথে তার শরীর খারাপ হতে পারে। জকির বোকামিতে সে হারতে পারে। ঘোড়ার শক্তি আর জকির বুদ্ধির সঙ্গে ট্রেনারের তালিম এক হলে তবে সেই ঘোড়া জেতে। অতএব এই পাঁচ পাউণ্ড জলে গেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে!

হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল, 'হ্যারি। হ্যারি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লিজা ছুটে আসছে। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে হ্যারি। তুমি খেলেছিলে?'

'কী করে খেলব? তুমি নিষেধ করলে!'

'ওহো, আই অ্যাম সরি, রিয়েলি, আই মিন। আমি তোমার উপকার করতে গিয়ে অপকার করে ফেললাম। কি যে খারাপ লাগছে।' লিজার নিঃশ্বাস টের পাচ্ছিল হরিমাধব।

সে বলল, 'ও কিছু নয়। তুমি মন খারাপ করো না।'

'ও কে। এবার আর তিনটে স্বপ্নে পাওয়া ঘোড়ার নাম বল।'

'যদি হেরে যায়।'

'যায় যাবে।'

'না। তুমি দ্বিতীয় ঘোড়ার নামটা শোন। যদি জেতে তাহলে তৃতীয়টির নাম বলব।' পকেট থেকে ট্রেনে লেখা কাগজ বের করে সে বলল, 'সাত নম্বর ঘোড়া, পাঁচ নম্বর বাজিতে। নাম হল ডায়মণ্ড স্পার্ক। হারলে কিন্তু আমার দোষ নেই।'

'কিন্তু তোমাকে আমি কোথায় পাব?'

'এখানেই।'

'দূর! এত ভিড়ে খুঁজে পাওয়া যায়? দ্বিতীয় বাজি শেষ হবার

পর থেকেই তোমাকে খুঁজে খুঁজে এই এখন পেলাম। তুমি বরং ওই ওপরে রেষ্টুরেণ্টে এসো, প্লিজ।'

লিজাকে হ্যাঁ বলল সে। লিজা চলে যেতে সে আবার খোঁজ করতে শুরু করল। চতুর্থ বাজি হয়ে গেল। এ বাজিতেও সে কোন ঘোড়া ধরতে পারেনি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখ স্থির হল। একটি ইংরেজ যুবকের কোমর ধরে যে মেয়েটি যাচ্ছে তার ছবি পকেটে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে গত দশদিন। দ্রুত কাছে চলে এল সে। ঠিক পেছনে। মেয়েটি চমৎকার ইংরেজিতে বলছে, 'তোমার টিপে খেলে আমি তিনশো পাউণ্ড হেরে গেলাম।'

'সরি ডার্লিং।'

'ডোণ্ট সে মি ডার্লিং। আর রেস খেলব না। চল, ওই রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে বসি।' ওরা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে লাগল। মেয়েটি সুন্দরী। অন্তত পেছন থেকেও ছন্দ দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু কিভাবে কথা বলবে? যে মেয়ে অনায়াসে তিনশো পাউণ্ড হারতে পারে তার ক্ষমতা কতখানি? মালিকের চেহারা তার মনে পড়ল। অন্তত গিয়ে বলতে পারবে সে কথা বলেছে। অতএব কথা বলা দরকার।

রেষ্টুরেণ্ট থেকে রেসকোর্স স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝারি গোছের হলঘরে ভিড় মন্দ নয়। ওরা কাউণ্টার থেকে দুটো বিয়ারের ক্যান নিয়ে মাঠের দিকের বড় জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। হরিমাধব কি করবে বুঝতে না পেরে ওদের পাশে রেশ বইতে মগ্ন একটি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, 'মাপ করবেন, ডায়মণ্ড স্পার্ক কত নম্বর বলতে পারেন?'

বৃদ্ধ খুব বিরক্ত হলেন মনোযোগ নষ্ট হওয়ায়, 'কেন? তোমার কি মনে হয় ঘোড়াটা জিতবে?'

'হ্যাঁ। ও তো জিতেই গেছে।'

'ইয়ার্কি মেরো না ছোকরা। তিন তিনটে থ্রি ইয়ার্স ওল্ড ঘোড়া আছে এ বাজিতে। তাদের হারিয়ে ডায়মণ্ড স্পার্ক জিতবে। বললেই হল?' বৃদ্ধ এমন জোরে চিৎকার করলেন মেয়েটি এদিকে ফিরে তাকাল। হরিমাধব সুযোগটা কাজে লাগাল, 'ঠিক আছে, আমি তো

এখানেই আছি। যদি নাও জেতে লড়ে হারবে। আপনি নম্বরটা বলুন না?'

বৃদ্ধ জবাব না দিয়ে সামান্য সরে দাঁড়িয়ে আবার বই দেখতে লাগলেন। এবার মেয়েটি তার হাতের বই খুললো, 'আপনার ঘোড়ার নম্বর সাত।' বলে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ঘোড়াদের তখন স্টার্টিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনে মনে মা কালীর নাম জপতে লাগল। যদ্দুর মনে আছে এই ঘোড়াটা এ বছর মাত্র তিনটি রেসে ছুটেছে। তিন বারই অল্প দূরত্বের রেস ছিল। পেছন থেকে ছুটে এসে তিনবারই চতুর্থ হয়েছে। আজ মাঝারি দূরত্বের রেস। ঘোড়াটা আরও দুই ফার্লং বেশি ছুটতে পারবে। যে গতিতে সে আগের বাজিতে ছুটে এসেছিল তাতে এই বাড়তি দূরত্বে তার পক্ষে রেস জেতা সম্ভব হবেই। থিওরি অফ ভূমা বলে যে কোন কোন ঘোড়া অল্প দূরত্বে শরীর গরম করতে পারে না। তাদের জন্য মাঝারি বা বেশি দূরত্ব থাকলে গা গরম হয় এবং সেই সময় তাদের গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া এই ঘোড়াটা চতুর্থ হয়েও যে সময় করেছে তা মোটেই ফেলনার নয়। ভূমা বলেছেন এইসব ঘোড়ার ওপর পান্টার-দের নজর সাধারণত পড়ে না এবং এরকম ক্ষেত্রে চারটের মধ্যে দুটোয় এরাই জেতে। মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিল হরিমাধব। মেয়েটি বেশ সাহসী মালিকের চরিত্রের সঙ্গে কোন মিল নেই। এরকম মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেলে যে কোন পুরুষ খুশি হবে। কিন্তু এর বয়স বাইশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় না।

রেস শুরু হল। অনেক দূর থেকে ঘোড়াগুলো ছুটে আসছে। মাইকে রিলে হচ্ছে। যেসব ঘোড়া এগিয়ে আছে তাদের মধ্যে ডায়মণ্ড স্পার্ক নেই। বারোটি ঘোড়া ছুটছে এখন এবং এই মুহূর্তে সে নবম। ঘোড়াটাকে গুণে গুণে খুঁজে বের করল সে। জেতার কোন আগ্রহই নেই জকি সাদা জার্সি পরেছে। দর্শকরা চিৎকার করছে পছন্দের ঘোড়ার নাম ধরে। এখনও আড়াই ফার্লং বাকি। বাঁক ঘুরছে ওরা। ভাষ্যকার বলে যাচ্ছেন ঘোড়াদের অবস্থান। হঠাৎ নড়ে উঠল সে। ডায়মণ্ড

স্পার্ক চার থেকে তিনে উঠে এল। তার সামনে মাত্র দুটো ঘোড়া। একটু তফাতে থেকে ডায়মণ্ড স্পার্ক গতি বাড়াচ্ছে। সাদা জার্সি বিদ্যুৎ হয়ে উঠেছে। মাঠ চুপ। অনেক, অনেকটা ব্যবধান রেখে ডায়মণ্ড স্পার্ক জিতে গেল। হরিমাধব মেয়েটিকে শুনিয়ে বৃদ্ধকে বলল 'কী হল? জিতলো তো।'

বৃদ্ধ ছুটে এলেন, 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছি, তুমি কী করে বুঝলে ডায়মণ্ড স্পার্ক জিতবে। ওঃ, আমি কি বোকা! লুক, কত ডিভিডেণ্ড দিয়েছে।'

হরিমাধব দেখল পেছনের বোর্ডে লেখা ফুটেছে, এক পাউণ্ডের টিকিটে আট পাউণ্ড পাওয়া যাবে। সে ঠোঁট কামড়ালো, দশ পাউণ্ড খেলে আশি পাউণ্ড পাওয়া যেত। এতদিনের গবেষণা করা ফর্মুলা লণ্ডনের রেসের মাঠে কাজ দেবে এমন করে তা কে জানত। কলকাতায় কোন কোনদিন এই ফর্মুলায় হিসেব করে পরের দিন কাগজে ফল দেখেছে, একটাও মেলেনি।

'ইউ আর লাকি!'

গলাটা কানে যেতে চমকে মুখ ফিরিয়ে লাজুক হাসল হরিমাধব। মেয়েটি এখন তার সামনে দাঁড়িয়েছে যার ছবি তার পকেটে। রঙিন চশমার আড়ালে চোখ বোঝা যাচ্ছে না। ঠোঁট দুটো নড়ল সামান্য, 'কত খেলেছেন আপনি?'

এরকম প্রশ্ন অচেনা মানুষকে করা সৌজন্যে পড়ে না। তবু হরিমাধব কিছু মনে করল না, 'আমি প্রতি বাজিতে রেস খেলি না। ইনফ্যাক্ট আমি আমি রেস খুব কমই খেলি।

'এটা খুব বুদ্ধিমানের উত্তর। কারণ একবারই ঝড়ে বক মরে।' কাঁধ-নাচাল মেয়েটি, 'এর পরের রেসে কি ঘোড়া জিততে পারে তা নিশ্চয়ই প্রেডিক্ট করতে পারবেন না?'

'আমি একটা টিব্‌ল টোট টিকিট কেটেছি।'

'আচ্ছা! প্রথম লেগ হয়েছে। দ্বিতীয় লেগে ক'টি ঘোড়া নিয়েছেন?'

'একটিই।' হরিমাধবের কথা শেষ হতে না হতেই লিজা ছুটে এসে

ওর হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল, 'ওহো, হ্যারি, তোমার জন্যে আমি দুশো পাউণ্ড জিতেছি। টেন টু ওয়ান প্রাইস পেয়েছিলাম বুকির কাছে। এখন মনে হচ্ছে আগে কেন বেশি খেললাম না। দ্বিতীয় বাজিতে যদি তোমার ঘোড়া খেলতাম! উঃ,, কি বোকা আমি। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে হাত ঝাঁকাতে লাগল সে।

'এমন করে বলো না, তুমি আমাকে গাইড করে এখানে এনেছ।'

'কি ভদ্র তুমি! আমি গাইড না করলেও তুমি আসতে পারতে। যাহোক, নেক্সট রেস হল প্রিন্সেস কাপ। আমি আর সি-কুইন খেলছি না। তোমার ঘোড়া খেলব। তুমি রেস শেষ হলে এখানে এসো। আমরা একসঙ্গে ফিরব। তোমার আপত্তি না থাকলে আজ রাত্রে তোমাকে ডিনার খাওয়াবো আমি। ওকে! বাই!' লিজা চলে গেল দৌড়ে।

মেয়েটি এতক্ষণ চুপচাপ এসব শুনছিল। তার বয়ফ্রেণ্ড অসহিষ্ণু গলায় ডাকল, 'চল। নেক্সট রেসে খেলব।'

'দাঁড়াও।' ওর দিকে না তাকিয়ে হাত নেড়ে থামতে বলল। তারপর হরিমাধবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাজিতে আপনার পছন্দ কি জানতে পারি?'

'নাই জানলেন। ঝড়ে তো বারে বারে বক মরে না।'

'গুড। তা ওই মেয়েটি কি আপনার বান্ধবী?'

'না, আজই এখানে আসার পথে ট্রেনে আলাপ হল।'

'আপনি ট্রেনে এসেছেন লণ্ডন থেকে?'

'হ্যাঁ।' হরিমাধব হাসল, 'আমার তো গাড়ি নেই। ইংলণ্ডে দিন দশেক হল বেড়াতে এসেছি।'

'আপনি পাকিস্থানি না বাংলাদেশি?'

মিথ্যে কথা বলতে পারল না হরিমাধব, 'নাঃ, আমি ভারতীয়।'

মেয়েটির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, 'আগে বুঝলে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না।'

'কেন? ভারতীয়দের ওপর আপনার রাগের কারণ?'

'আমি ওদের সঙ্গে মিশতে চাই না। যাই হোক, কি আপনার পছন্দ বলতে চান না?'

'বেশ। যদি জেতে কি খাওয়াবেন?

'এনি থিং।' মেয়েটি হাসল, 'ডিনার তো একজনের সঙ্গে খাবেন কথা দিলেন।'

'এক কাপ কফি। এখানেই। আপনি ঈগল-হাই খেলতে পারেন। ওটাই আমার টিকিটের দ্বিতীয় ঘোড়া। যদি না জেতে দোষ দেবেন না। রেসে নিশ্চয় বলে কোন কথা নেই।'

কিন্তু ঈগ্‌ল-হাই জিতল। আলাদা করে একটা পয়সাও খেলেনি সে। ওই বৃদ্ধ তার কথা শুনে ঈগ্‌ল-হাই খেলে অনেক পাউণ্ড পেমেন্ট পেয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। লিজা এসে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। ঈশ্বর যদি হরিমাধবের সঙ্গে তার দেখা না করিয়ে দিতেন তাহলে এখন সে হাজার পাউণ্ডের মালিক হতো না। ওদের কাণ্ড দেখে হরিমাধবকে ঘিরে বেশ ভিড় জমে গেল। সাহেব মেমরা জানতে চাইছে এর পরের রেসে কোন ঘোড়া জিতবে। সেইটেই দিনের শেষ রেস। হরিমাধবের এসবে মন নেই। সে কেবলই মেয়েটিকে খুঁজছে ঈগ্‌ল-হাই-এর টিকিট কেটে সে ফিরে আসেনি। ওকে ওভাবে ছেড়ে দেওয়াটা বোকামি হয়েছে। এতবড় রেস কোর্সে কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। জেতার টাকা নিয়ে সে চলে যেতেও পারে।

ভিড়, লিজা, বৃদ্ধ সবাইকে সে চিৎকার করে জানাল আর কোন ঘোড়া জিতবে বলে কাছে খবর নেই। লিজা বলল, 'কি বাজে কথা বলছ। খবর কি? তুমি তো স্বপ্ন দেখেছ!'

'আমার স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে।' খুব বিরক্ত গলায় বলল হরিমাধব। ভিড় সরে গেলেও লিজা সরছিল না। সে কেবলই বলছে, 'তুমি কেন বলছ না, তখন আমায় প্রমিস করেছিলে একটার পর একটা বলবে।'

এইসময় মেয়েটিকে একা ফিরে আসতে দেখল। হাতে কফির কাপ। সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার কথা রাখলাম। আপনার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে পারি?

'নিশ্চয়ই।' কফির কাপ হাতে নিয়ে হরিমাধব লিজাকে বলল, 'বার বার, তিনবার ঠিক হয়েছে। আর আমার ওপর নির্ভর করো না

'তুমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলবে?'

হ্যাঁ।

'বেশ, কথা বলে নাও।' লিজা গম্ভীর মুখে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। হরিমাধব মেয়েটির দিকে তাকাল, 'এবার বলুন।'

'আমি দুহাজার পাউণ্ড জিতেছি। এটা অবশ্য ঘটনা। গত এক বছরে আমি এই মাঠে প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড হেরেছিলাম। আজকেও হার হচ্ছিল কিন্তু জিতে গেলাম। আপনার নাম?'

'হরিমাধব।'

'আমি অঞ্জনা।'

হরিমাধব মনে মনে বলল তোমার সব জানি মেয়ে। কিন্তু তার বদলে সে হাসল। অঞ্জনা বলল, 'আপনি কবে ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন?'

'কাল সকালে।'

'ওঃ তাই?'

'আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে, আই মিন পাউণ্ড।'

'বাঃ আপনি তো আজ অনেক রোজগার করতে পারতেন।'

'আবার বলছি আমি রেস খেলি না।' সে ঘুরে দাঁড়াল.

'কী দেখছেন?'

'এই রেসে সাত নম্বর ঘোড়ার দর কত দেখছিলাম।'

অঞ্জনা দেখল বোর্ড। তারপর হেসে বলল, 'ইম্পসিব্‌ল্। টুয়েন্টি টু ওয়ান।'

'ওই শব্দটি কেবল মূর্খদের অভিধানে থাকে।'

'আপনার টিকিটে সাত নম্বর আছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, রোজই তো হারি। আজও নাহয় হারলাম।' বলে অঞ্জনা চলে গেল বেটিং রিঙে। লিজার জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল তার।

সে একটু দূর থেকে অঞ্জনাকে অনুসরণ করল। তার হারাতে দেওয়া ঝুঁকি হয়ে যাবে। একটু দূরত্ব রেখে সে দেখল ব্যাগ থেকে প্রায় পুরো নোটের গোছাই সে বেট রাখল। এবার ভয় হল। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়ে ঘরে থাকে না, তাকে নাকে দড়ি দিয়ে দশদিন ঘোরাল, বাপের প্রচুর টাকা সত্ত্বেও এভাবে হারুক তা সে চায় না। অঞ্জনা ফিরতেই সে সরে দাঁড়াল। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে অঞ্জনা চারপাশে তাকাতে না তাকাতেই রেস শুরু হল। দিনের শেষ বাজি। ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অঞ্জনাকে দেখা যাচ্ছে। বেশ উত্তেজিত হয়ে চেঁচাচ্ছে। আস্তে আস্তে সে স্থির হয়ে গেল। সবাই যখন চেঁচাচ্ছে তখন তার মাথা নিচু। হরিমাধব বুঝে গেল সাত নম্বর হেরে গিয়েছে। ফেবারিট ঘোড়া জেতায় মাঠে আনন্দের বন্যা। অঞ্জনা পাথরের মত দাঁড়িয়ে। তার সেই বয়ফ্রেণ্ড ধারে কাছে নেই। হরিমাধব কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। কি দরকার ছিল ওকে ঘোড়ার নম্বর বলার। এইসময় অঞ্জনার বয়-ফ্রেণ্ডকে দেখল সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে আসছে। সে যে জিতেছে বোঝা যাচ্ছিল। অঞ্জনা ক্লান্ত হয়ে মাথা নাড়ল। ছেলেটি টিকিট দেখাল তার। মাঠ থেকে দর্শকরা বেরিয়ে যাচ্ছে যখন তখন মাইকে ঘোষণা করা হল সবাই যেন অপেক্ষা করে। প্রথম হওয়া এক নম্বর ঘোড়ার জকির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় হওয়া সাত নম্বরের জকি অভিযোগ করেছে যে রেস চলার সময় সে চাবুক চালিয়েছিল তা সাত নম্বর ঘোড়ার গায়ে লাগায় তার গতি শ্লথ হয়েছে এবং এই কারণেই সে জিততে পারেনি। বিচারকরা ভিডিও টেপ দেখে এবার রায় দেবেন।

হঠাৎ একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। অঞ্জনা তার ব্যাগ আঁকড়ে ধরল। ওর বয়ফ্রেণ্ডের মুখ গম্ভীর হল। এবার সামনে এগিয়ে গেল হরিমাধব, 'অঞ্জনা!'

'ওঃ!' অঞ্জনা ঘুরে দাঁড়াল, 'কী হবে?'

'যদি সত্যি চাবুক লেগে থাকে তাহলে আপনি জিতবেন। কারণ চাবুক না লাগলে সাত নম্বর স্বচ্ছন্দে জিততো।'

'নো নেভার। এক নম্বর জিতেছে, জিততো।' গর্জে উঠল অঞ্জনার বয়ফ্রেণ্ড।

'চেঁচিও না। ইভন মানির ঘোড়া জিতে কেউ অত অহঙ্কার করলে মানায় না।'

'আমি পেমেন্টের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। পেমেন্ট আমি পাবোই।' অঞ্জনার বয়ফ্রেণ্ড চলে গেল। আর তখনই ঘোষণা করা হল, 'ইওর অ্যাটেনশন প্লিজ। দি অবজেকশন রেইজড্ বাট্ দি জকি অফ হর্স নাম্বার সেভেন ইজ আপহেল্ড। দি রিভাইজড রেজাল্ট অফ দি লাস্ট রেস অফ দি ডে ইজ ফার্স্ট নাম্বার সেভেন, সেকেণ্ড নাম্বার থ্রি, থার্ড নাম্বার ফাইভ। হর্স নাম্বার ওয়ান ইজ স্ক্র্যাচ্ড্।'

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্র চিৎকার করে দু'হাতে হরিমাধবকে জড়িয়ে ধরল অঞ্জনা, 'আমি আজ বিয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ড জিতেছি। আর বাবার কাছে হাত পাততে হবে না। ও, কি ভালই না লাগছে!'

'যান, পেমেন্ট নিয়ে আসুন।'

'আপনি চলুন আমার সঙ্গে। অনেকগুলো পাউণ্ড।'

অঞ্জনা গুণে গুণে পাউণ্ড নিল। চেক নয়, নোট। তার বয়ফ্রেণ্ড একপাশে শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল। ওরা সবাই একসঙ্গে গেটের দিকে এগোচ্ছিল। অঞ্জনা বলল, 'দয়া করে বলবেন না যে আপনি ট্রেনে ওই মেয়েটির সঙ্গে ফিরবেন। আপনি আমার গাড়িতে লণ্ডনে ফিরবেন। কিন্তু, একটা কথা, আপনি তখন আমাকে সত্যিকথা বলেননি!

'কেন? কী কথা?' অবাক হল হরিমাধব। মেয়েটি হারেনি জেনে তার ভাল লাগছিল। অঞ্জনা বলল, 'আমি শুনেছিলাম আপনি একটা টিকিট কেটেছিলেন!'

'ও হ্যাঁ, তাই তো!' দাঁড়িয়ে পড়ল হরিমাধব! বুক পকেট থেকে টিকিটটা বের করতে না করতেই মাইকে ঘোষণা করা হল, 'এ্যাজ দেয়ার ইজ নো জ্যাকপট টিকিট আফটার ফোর্থ লেগ, এন্টায়ার জ্যাকপট ডিভিডেণ্ড অফ দি ডে ইজ ক্যারিড ওভার টু দ্য নেক্সট রেসিং ডে।

দি ট্রিব্‌ল ডিভিডেণ্ড অফ দ্য ডে, উইনার অফ অল দ্য হর্স থ্রি লেগস ইজ সিক্সটি টু থাউজেণ্ড থ্রি হানড্রেড এণ্ড টোয়েন্টি পাউণ্ডস।' ঘোষণা শেষ হতেই টিকিটটাকে দেখল হরিমাধব। হ্যাঁ, পর পর তার নির্বাচিত তিনটে রেসে জেতার ঘোড়ার নম্বর টিকিটে লেখা রয়েছে। অঞ্জনা এগিয়ে এসে টিকিটটা দেখল। তার চোখ বড় হয়ে উঠল। সে বলল 'মাই গড। সিক্সটি থাউজেণ্ড থ্রি হানড্রেড টোয়েন্টি টু পাউণ্ডস্‌। আপনি জানতেন ওই তিনটে ঘোড়া জিতবেই। কিন্তু জানলেন কী করে?'

'স্বপ্নে।'

'স্বপ্ন? স্বপ্নে তিনটে ঘোড়া পেয়ে গেলেন?'

'আমি স্বপ্নে অনেক কিছু পাই।' হরিমাধব হাসল, 'কিন্তু এই টিকিটটা কোথায় দেখাবো?'

দশ মিনিট বাদেই একেবারে কড়কড়ে নোটে অতগুলো পাউণ্ড পেয়ে গেল। প্রায় প্রতিটি পকেট ভরে গেল তার। কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন চেকে পেমেণ্ট করতে, কিন্তু সে রাজি হয়নি। অঞ্জনা তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার বয়ফ্রেণ্ড তখনও দাঁড়িয়ে আছে কালো মুখে। আশে পাশে কোথাও লিজাকে দেখতে পাওয়া গেল না। ওদের গাড়ির পেছনের সিটে সে উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। হঠাৎ হরিমাধবের মাথায় অন্য চিন্তা এল। ট্যাক্স কেটে যে পাউণ্ড হাতে পাওয়া গেল তা ভারতীয় টাকায় প্রায় দশ লক্ষ নয় হাজার টাকার মত। এত টাকা সে কোনদিন রোজগার করতে পারবে কল্পনাও করেনি। লণ্ডনের চোর ডাকাতের গল্প সে শুনেছে। যে কোন মুহূর্তে সব লুট হয়ে যেতে পারে। কী করবে সে? চেক না নিয়ে বোকামি হয়েছে। কাল সকালে চলে গেলে কী করে ভাঙাবে এই চিন্তায় সে চেক নেয়নি। এখন মনে হচ্ছে হাতে যখন এতো পাউণ্ড এসে গেল তখন কালই যাওয়ার কী দরকার! কদিন আরাম করে থাকাই যাক না। দেশে ফিরে যদি মালিক কিছু বলে তাহলে এক কথায় চাকরি ছেড়ে এই টাকায় বাকি জীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে। নিজেকে

হঠাৎ অন্যরকম মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। নতুন ধরনের আত্মবিশ্বাস এসে যাচ্ছিল।

লণ্ডনে ঢুকে মুখ ফিরিয়ে অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

তাড়াতাড়ি সজাগ হয়ে সে বলল, 'স্ট্র্যাণ্ড রোডে।'

একটু এগোতেই অঞ্জনা তার বয়ফ্রেণ্ডকে বলল গাড়ি দাঁড় করাতে। গাড়ি থামতেই সে দরজা খুলে নেমে হরিমাধবকে ডাকল, 'নামুন, পাশের রাস্তাটাই স্ট্র্যাণ্ড রোড।'

অঞ্জনার বয়ফ্রেণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নামছ কেন?'

'ওহো! তুমি তো জানো আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দিই না। বাই।' হাত নেড়ে সদ্য গাড়ি থেকে নামা হরিমাধবকে অঞ্জনা বলল, 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রাস্তাটা পেরিয়ে হরিমাধব বলল, 'আর আসতে হবে না। আমি চিনতে পেরেছি।'

'আপনি জানেন আপনার কাছে কত পাউণ্ড আছে। চলুন, কথা বাড়াবেন না।'

'সে তো আপনার কাছেও আছে।'

'আপনার তুলনায় খুব সামান্য। তাছাড়া মেয়েদের কেউ চট করে সন্দেহ করে না।'

অতএব অঞ্জনাকে নিয়ে হোটেলের ঘরে ফিরে এল হরিমাধব। আজ সকাল পর্যন্ত যে ছিল আলেয়ার মত, যাকে খুঁজে পেতে হন্যে হয়েছে সে নিজে এসেছে সন্ধেবেলায় তার ঘরে। অবশ্য লণ্ডনে রাত নামতে অনেক দেরি আছে। দিন যেন এখন শেষ হতেই চায় না।

'এত ছোট ঘরে আপনি থাকেন?' নাক সিঁটকালো অঞ্জনা। তারপর টেবিলের ওপর উঠে বসল। হরিমাধব বলল, 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ভারতীয়রা বেশি পায় না।'

'ভারতীয়রা অনেক কিছুই কম পায়। কিন্তু এখন আপনি কি করবেন?'

'আপনি যা বলবেন!'

'আমি যা বলব তা আপনি করতে যাবেন কেন?'

'কারণ এই শহর আমি ভাল চিনি না।'

'ওহো! আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম আপনি এত পাউণ্ড নিয়ে এখন কী করবেন?'

'ভাবিনি, ভাবার সময় পাইনি।'

'তবু—।'

হরিমাধব চোখ বন্ধ করল, 'প্রথমে ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াবো।'

'গ্র্যাণ্ড!' অঞ্জনা হাততালি দিয়ে উঠল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? সব দেশ যাবো, শুধু ভারতবর্ষে নয়, ওখানে কখনও যেতে পারব না।'

'কেন?'

'কারণ নিশ্চয়ই আছে।'

'আপনার বয়ফ্রেণ্ড?'

'কে? ওহো। না, না, এখন আমি কারো সঙ্গে স্টেডি নই; একটা ছেলেকেও আর ভাল লাগছে না আমার। অল্পবয়সী ছেলেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলি আমি।' অঞ্জনা দুটো হাত নাড়ল, 'আপনি কি বাইরে খাবেন? আপনার সেই বান্ধবী এখানকার ঠিকানা জানে?'

'না। তিনি আমার বান্ধবী নন। ট্রেনেই আলাপ। আপনি আমার পাঁচমিনিট সময় দিন, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।' উত্তরের অপেক্ষা না করে হরিমাধব বাথরুমে চলে এল পোশাক নিয়ে। তার সবচেয়ে সেরা পোশাক পরে মনে হল এই পাউণ্ডগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা বোকামি হবে। কিন্তু কোথায় রাখা যায়? হাজার খানেক পকেটে রেখে বাকিটা পুরোনো প্যান্টের পায়ের মধ্যে গিঁট বেঁধে থলির মত তৈরি করে তাতে ভরে সে ঘরে ফিরে এল।

অঞ্জনা বলল, 'আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে। পাউণ্ডগুলো ঘরে রেখে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় হোটেলের ভল্টে রেখে গেলে ভাল করতেন। ওগুলো যে আপনার পাউণ্ড তার প্রমাণ রেসকোর্সের দেওয়া সার্টিফিকেট।' অঞ্জনা টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল, 'কিন্তু আপনি যে সেজেছেন তাতে আমাকে একবার আমার ফ্ল্যাটে ফিরেই যেতে হচ্ছে এই পোশাকে অনেক জায়গায় ঢোকা যাবে না। চলুন।'

হোটেলের ম্যানেজার অত পাউণ্ড দেখে হতভম্ব। অঞ্জনা তাকে সব বুঝিয়ে বলতে তিনি সব ভল্টে ভরে রসিদ দিলেন। সেইসঙ্গে পুলিশকেও ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলেন। বাইরে আর পাতাল রেলে নয়, ট্যাক্সি নিল ওরা। মিনিট পনের বাদে যখন হরিমাধব অঞ্জনার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছে তখন সেই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা। তিনি বড় বড় চোখ করে তাকাতেই হেসে ফেলল হরিমাধব। বৃদ্ধা বললেন, যাক, পেয়ে গেছ তাহলে!'

অঞ্জনা অবাক হল, 'কী ব্যাপার? আপনার কি পরিচিত?'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'তোমারই দোষ বাপু! ছেলেটা বারবার আসছে আর দরজায় তালা দেখছে।'

সঙ্গে দঙ্গে অঞ্জনা ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি কে?'

'আমি যেই হই এখন আপনার বন্ধু। ভেতরে চলুন। ওখানেই কথা বলব।'

অঞ্জনার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন পালটালো। দরজা খুলে আলো জেলে সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন। ব্যাপারটা কী আমি জানতে চাই।'

সোফায় বসে হরিমাধব বলল, 'আমি লণ্ডনে এসেছিলাম আপনার খোঁজে। দশদিন ধরে চেষ্টা করেও দেখা পাইনি। মাঝখানে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আজ সকালে এখানে এসে শুনলাম যে আপনি এপসমে রেস খেলতে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়ে গেলাম। তারপরের ঘটনাগুলো আপনি জানেন।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে কেন এসেছিলেন?'

'দয়া করে এই প্রশ্ন আমাকে করবেন না। যে জন্যে এসেছিলাম সেটা আর দরকার নেই।'

'কেন?'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কারো ওপর নির্ভর করতে চান না।'

'আপনি কি কোন এজেন্সির লোক?'

'না।' হরিমাধব হাসল।

'আপনাকে কি আমার বাবা পাঠিয়েছেন?'

'যদি পাঠিয়েও থাকেন তাহলে এখন আর সেটা কারণ নয়।'

'আপনি সত্যি কথা বলুন।'

'হ্যাঁ। তিনি আপনার ব্যাপারে খুব চিন্তিত। আপনার জীবন-যাপন নিয়ে অনেক কথা তাঁর কানে গিয়েছে। আমি তাঁর কোম্পানিতে কাজ করি। অতএব তিনি আমাকে হুকুম করতেই পারেন।'

'তাই বলুন।' উঠে দাঁড়াল অঞ্জনা, 'আপনাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বলতে ইচ্ছে করছে আমার। আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।'

'শব্দটা ভেবে ব্যবহার করলেন না। আপনার কাছে যে পাউণ্ড এখন আছে তা কোন প্রতারক আপনাকে পাইয়ে দেবে না।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল অঞ্জনা, 'আপনি আমার বাবাকে ফিরে গিয়ে কী বলবেন?'

'আপনার দেখা পাইনি।'

চমকে হাত সরাল মুখ থেকে অঞ্জনা। তারপর চাপা গলায় বলল, 'সত্যি?'

'হঁ্যা।'

'কেন?'

'কারণ আপনাদের দু'জনের মধ্যে কোন মিল নেই। এখন আপনাকে পেলে উনি কিছুতেই সুখী হবেন না আর আপনিও মানতে পারবেন না তাঁর জীবন।'

'থ্যাঙ্কস।'

'আমাদের আজ বাইরে খাওয়ার কথা ছিল, তাই না? সত্যি বলতে কি আমি অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি। বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে আমার।'

'একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।' অঞ্জনা ভেতরের ঘরে চলে গেল। হরিমাধব ঘরটিকে দেখল। একটা দেওয়ালে মাইকেল জ্যাকসন গীটার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। উল্টোদিকের দেওয়ালে যে পোস্টার তাতে সূর্য নেই, গাছপালা নেই, ঘাস ঘরবাড়ি জল নেই শুধু বালিয়াড়ির ওপর কিসের যেন ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে। ছবিটার দিকে তাকালেই মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ওই ছায়াদের গায়ে বিষাদ মাখামাখি। মাইকেল জ্যাকসন গান গাইতে গাইতে যেন আচমকা থেমে গিয়ে ওই বিষাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এরকম বিপরীতধর্মী ছবি কারো দেওয়ালে সে টাঙাতে দ্যাখেনি। এইসময় অঞ্জনা বেরিয়ে এল। বেশ সাজুগুজু করে। এবং সেই দেখে চমকে উঠল হরিমাধব। কাঁচা সোনা রঙা শাড়ির প্রান্তে লালের রেখা, সেই শাড়ি শরীরে সেঁটে বসে রয়েছে, ওপরে পিঙ্ক কার্ডিগান, মাথায় কাঁচা সোনা রঙের চওড়া ফিতে। হরিমাধব মনের ভাব গোপন করে বলল, 'আমরা কোথায় যাব?'

হরিমাধবের মুখের ভাব দেখেও না দেখার ভাণ করে বলল, 'আপনি মদ খান?'

'কোন নেশা নেই?'

'তাহলে সেইরকম জায়গায় যাব চলুন।'

বাইরে বেরিয়ে ওরা একটা ট্যাক্সি নিল। মজা লাগছিল হরিমাধবের। সকালে প্রতি পাউণ্ড পেনি হিসেব করে চলতে হচ্ছিল, আর এখন! একেবারে রূপকথার গল্পের মত ভাগ্য ঘুরে গেল তার। আলাদিন আশ্চর্য প্রদীপ কি অঞ্জনা? কারণ অঞ্জনার সূত্রেই রেসের পাউণ্ড পকেটে এল!

ট্যাক্সিতে বসে অঞ্জনা বলল, 'আমাকে একটা জায়গায় মিনিট দশেকের জন্যে যেতে হবে। প্রতিদিন যেমনই থাকি আমি একবার

যাই। আপনি সঙ্গে আছেন, চলুন, ইচ্ছে হলে ভেতরে যেতে পারেন, নাহলে বাইরে অপেক্ষা করবেন।'

'জায়গাটা কোথায় ?

'আপনি লণ্ডনের সব জায়গা চেনেন ?'

'না !'

'তাহলে, অবান্তর প্রশ্ন ?'

হরিমাধব মনে মনে চটে গেল। পাউণ্ডগুলো পকেটে আসার পর থেকেই তার আত্মবিশ্বাস বেশ বেড়ে যাচ্ছিল। সে বলল, 'এরকম কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই।'

'ভেবে দেখুন আমি ভুল বলিনি।'

একটা তিনতলা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল অঞ্জনা। ভাড়াটা সে নিজেই দিল। দিয়ে বলল, 'আপনি কি সঙ্গে আসবেন ?'

'আপত্তি নেই।'

সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠে অঞ্জনা বেল টিপতেই এক সাহেব দরজা খুললেন। খুলে হেসে বললেন, 'গুড ইভনিং। এসো, নোরা একটু বেরিয়েছে।'

'ও কেমন আছে ?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল অঞ্জনা।

'ফাইন।'

'আমার পরিচিত, ইনি মিস্টার স্মিথ।' পরিচয় করিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল অঞ্জনা। মিস্টার স্মিথ তাকে বসতে বলে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ভারতীয় ?'

'হ্যাঁ।' হরিমাধব মাথা নাড়ল।

'আমার খুব ইচ্ছে ছিল ভারতবর্ষে যাওয়ার। হয়নি। বয়সও হয়ে গেছে। ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে খুব ভাল লাগে। তাই কাগজে অঞ্জনার বিজ্ঞাপন পড়ে যোগাযোগ করেছিলাম।'

কথাটার মানে বুঝতে পারছিল না হরিমাধব। এইসময় ভেতরের ঘর থেকে অঞ্জনার গলা ভেসে এল, মিস্টার স্মিথ, ওঁকে একটু এঘরে পাঠিয়ে দেবেন ?'

মিস্টার স্মিথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'যান, ভেতরে যান।'

মধ্যবিত্ত বাড়ি। পাশের ঘরে ঢুকে হকচকিয়ে গেল হরিমাধব। অঞ্জনা একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। বড় জোর মাস সাতেকের বাচ্চা। বাচ্চাটা প্যাটপেটিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অঞ্জনা হাসল, 'বলুন তো এ কে?'

হরিমাধব মাথা নাড়ল, বলতে পারবে না সে।

'আমার ছেলে!' বলে চুমু খেল বাচ্চাটাকে অঞ্জনা।

'ও।' হাসল হরিমাধব।

'আপনি বিশ্বাস করছেন না?'

'করার কি কারণ আছে?'

'আছে। ও হবার পর আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, মিসেস স্মিথ রেসপন্স করেছিলেন। ওকে বছর ছয় ওঁরা দেখাশুনো করবেন। ওঁদের বাচ্চা নেই, বাচ্চা মানুষ করার খুব শখ ওদের। তারপর থেকেই সোনামনি এখানে, আমি রোজ দেখে যাই।'

'আপনি বিবাহিতা?' অবাক হয়ে গেল হরিমাধব।

'না।'

'সে কি?'

'আমি সিঙ্গল মাদার। আমার এক বয়ফ্রেণ্ডকে ভাল বেসেছিলাম। ও এসে গেল। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেল তার কিছুদিন পরে। ও চলে গেল, আমি একা হলাম। কিন্তু মনে হল বাচ্চাটাকে আমার চাই। তাই ও এল। ব্যাস। বাচ্চাটাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে চুমু খেল অঞ্জনা। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সোজা বাইরের ঘরে চলে এসে মিস্টার স্মিথকে বলল, 'আজ চলি। মিসেস স্মিথকে আমার কথা বলবেন। আসুন।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল ওরা। হরিমাধব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জনা বলল, 'আপনি আমার ছেলেকে দেখলেন। ওর জন্যে আমার কোন গ্লানি নেই। হয়তো ভারতবর্ষের মানুষ এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবে না। সেখানে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক লোকে

মেনে নেয়, কিন্তু বাচ্চা কোনমতেই নয়। আমার বাবা জানতে পারলে হয়তো মারাই যাবেন। বুঝতেই পারছেন কেন আমি দেশে ফিরে যেতে পারব না, কেন আমি বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি না।'

'কিন্তু এই জীবন কেন?'

'একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, তাই।'

ওরা অনেকক্ষণ কথা বলল না। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে ওরা ঢুকল। হরিমাধব কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হচ্ছিল না। সে মাঝে-মাঝেই অঞ্জনার দিকে অবাক চোখে তাকাচ্ছিল। এমন মেয়ে সে কখনও ছাখেনি। ওর বাবাকে সে গিয়ে এই কথা বললে কী ঘটবে, তা আন্দাজই করতে পারছিল না। হঠাৎ মনে হল, এই খবর দিলে মালিক সারাজীবন তাকে তোয়াজে রাখবে যাতে সে কাউকে না জানায়। ভাবা মাত্র কিছুটা স্বস্তি হল।

রেষ্টুরেন্টের খদ্দেরদের চেহারা দেখে সে বেশ সংকোচে পড়ল। সমাজের একেবারে ওপর তলার মানুষ এঁরা। পোশাক এবং কথাবার্তার ধরন সেই পরিচয় বুঝিয়ে দিয়েছে। হঠাৎই খেয়াল হল, সে এখন অনেক টাকার মালিক, টাকার কারণে হীনমন্যতা বোধে ভোগা উচিত নয়। বরং অঞ্জনার শাড়ি, চেহারা এবং তার দিকে যেসব পুরুষ-মহিলা সাগ্রহে তাকাচ্ছেন তাঁদের উপেক্ষা করা উচিত। কাঁচের দেওয়াল ঘেঁষে বসল ওরা। বড় বড় সুদৃশ্য স্ট্যাণ্ডে মোমবাতি জ্বলছে। শুধু সেই আলো কাঁচে পড়ে যে আলোর ঝকমকানি তুলছে তাতেই খাওয়া দাওয়া হচ্ছে।

অঞ্জনা বলল, 'পরিবেশটা কেমন লাগছে?'

'দারুণ!'

'আমি এখানে দ্বিতীয়বার এলাম। আমার বন্ধুবান্ধব এত কস্টলি জায়গায় আসতে চায় না। যাহোক, আপনি কবে দেশে ফিরে যাচ্ছেন?'

'ঠিক ছিল কাল সকালে। এখন আবার নতুন করে ভাবতে হবে।'

হেসে ফেলল অঞ্জনা, 'শেষ পর্যন্ত ফিরবেন তো?'

'না ফিরে উপায় কী। ভিসা ফুরিয়ে গেলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে এদেশ থেকে।'

'অন্যদেশ আছে।'

'সেখানে ও ঢুকতে গেলে ভিসা লাগবে।'

'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। তা দেশে কোন টান নেই? বিয়ে করেন নি?'

'নাঃ।'

অঞ্জনা মুখ ঘুরিয়ে অন্য পাশে তাকাল।

জীবনে প্রথমবার একটি রাজকীয় ডিনার খেল হরিমাধব। রূপোর পাত্রে রূপোর চামচে দিয়ে দামি রান্না খেতে খেতে ও কিন্তু ঠিক আনন্দ যাকে বলে, তা পাচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল এর বিল নিশ্চয়ই পঞ্চাশ পাউণ্ড ছাড়িয়ে যাবে। যতই হোক কলকাতায় দু'জনে হাজার টাকায় সবচেয়ে দামি ডিনার গ্র্যাণ্ড হোটেলে খেয়ে আসা যায়। বিল আসার আগে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এল। দামি স্যুট পরা এক ইংরেজ যুবক। এসে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'হেলো এ্যান, কেমন আছ? অনেকদিন বাদে তোমায় দেখলাম।'

'ফাইন। চমৎকার আছি। তুমি ভাল আছ তো?' অঞ্জনা হাসল।

'চলছে। এই পোশাকে তুমি কখনও আমার সঙ্গে বেরোওনি।'

'সময় কি সবসময় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে জন?'

'ভাল বলেছ। তোমাকে এখানে দ্বিতীয়বার দেখলাম।'

'হ্যাঁ প্রথমবার তোমার সঙ্গে এসেছিলাম। আলাপ করিয়ে দিই, জন, আমার প্রাক্তন বন্ধু। আমার বাচ্চার বাবা। যদিও ওকে আমি সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছি, আর ইনি—।'

'বুঝতে পেরেছি। অভিনন্দন।' হরিমাধবের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকাল জন। হরিমাধব বেশ নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিল। তাকে অভিনন্দন জানাবার কি আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল অঞ্জনা জানত এই রেষ্টুরেণ্টে জন নিয়মিত আসে। তাই তার সঙ্গে দেখা হোক এইকি ও চেয়েছিল?

'জন, তুমি কি বসবে?'

'না। আমার বান্ধবী ওই টেবিলে আছে।'

'হু ইজ শী? আমি কি চিনি?'

'সম্ভবত নয়। তবে টিভিতে দেখতে পার। ও খুব আপ কামিং এ্যাকট্রেস। আচ্ছা চলি। বাই।'

জন চলে গেল। অঞ্জনা এবার সামনে তাকাল, 'রাউণ্ড কমপ্লিট হল?'

'হল। কিন্তু আমার নাম হরিমাধব। পরিচয় করিয়ে দিতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।'

'নামে কী এসে যায়। আমার নাম সীতা হলে আপনার কী এসে যেত। কেমন খেলেন?'

'চমৎকার।' ঘড়ি দেখল হরিমাধব, 'এখন কোথায় যাবো?'

'ঘুম পাচ্ছে?'

'না।'

'ডিসকো ভাল লাগে?'

'আমি সব কিছু ভাল মানাতে পারি।'

'নাঃ। চলুন, টেমসের ধারে যাই।'

'এই ঠাণ্ডায়?'

'তাহলে আমার ফ্ল্যাটে। আড্ডা মারব।'

বিল এল। একশো কুড়ি পাউণ্ড। মানে ভারতবর্ষের টাকায় প্রায় তিন হাজার। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। তবু বিল মিটিয়ে দশ দশ পাউণ্ড টিপস দিল সে। চালাও হরিমাধব! ভারতবর্ষে তুমি কখনও আড়াইশোর ওপর বকশিস দেবার কথা ভেবেছ?

অঞ্জনা ফ্ল্যাটে ঢুকে বাইরের ঘরের আলো নিভিয়ে ভেতরের ঘরে চলে এল। এসে বলল, 'বাইরে আলো জ্বলতে দেখলেই বুঝে যাবে আমি ঘরে আছি।'

'কারা বুঝবে?'

'আমার পাওনাদার আর কিছু হুজুগে বন্ধু।'

'আপনি এভাবে ঘরে থাকেন নাকি?'

'থাকতে হয়।'

'যাচ্চলে! আর আমি দরজা বন্ধ দেখে বেল টিপে টিপে ফি
গিয়েছি।'

'ভালই করেছেন। তখন দেখা আপনাকে পাত্তাই দিতাম না।
অঞ্জনা ঘুরে দাঁড়ালো, 'কী খাবেন? হুইস্কি না অন্য কিছু?' 'খাওয়া
পর আবার মদ?'

'একদম ভেতো ভারতীয়দের মত কথা বলবেন না তো। খা
পেটে কেউ মদ খায় না।' অঞ্জনা একটা স্কচের বোতল আর দুটো গ্লা
টেবিলে রাখল, সেই সঙ্গে বরফের বাকেট। মদ ঢালতে ঢালতে বলল
'আমি কিন্তু রোজ মদ খাই না। মন খারাপ হলে খাই। তখন অব
কোনো নিয়ম-টিয়ম মানি না।'

'আজ কি মন খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'সেকি!'

'কেন? ও, অতগুলো পাউণ্ড জিতলাম বলে। পাউণ্ডের ভাব
কে ভাবে।'

'তাহলে মন খারাপ হবার কারণ কি মিস্টার জনের সঙ্গে দেখা হ
যাওয়া?'

'দূর। জনকে আমি মুছে ফেলেছি মন থেকে। হি ইজ ডেড
ও যদি ওই টিভি স্টারের সঙ্গে কিছুদিন স্টেডি থাকে তাহলে আমা
ভাল লাগবে। ছেলেটার মধ্যে একটা ভাল মন আছে।'

'তাহলে খারাপ কেন মন? আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে?'

'ঠিক তাই।'

হরিমাধব থতমত হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমা
খুব খারাপ লাগছে কথাটা শুনে। আসলে আমি একটা কর্তব
করতে এসেছিলাম। এসে মনে হচ্ছে না এলেই ভাল হত।'

'ছেড়ে দিন। মদ খান।' ঘড়ি দেখল অঞ্জনা, 'আমার স
আপনার কেমন লাগছে?'

'আমি খুশি।'

'কাল যাচ্ছেন?'

'বললাম তো এখনও ভাবিনি।'

'ভেবে ফেলুন, আর বেশি সময় নেই।' অঞ্জনা গ্লাস শেষ করল। 'আমি বলি কি আপনি থেকেই যান। আমার সঙ্গ পেয়ে আপনি যেমন খুশি, আমিও।'

'এই বললেন আমার দেখা পেয়ে মন খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কারণ আপনি বাবার লোক হিসাবে এসেছেন। থাকবেন?'

'বেশ। ভিসার মেয়াদ আছে এখনও অনেকদিন।'

'গুড।' নতুন গ্লাসে স্কচ ঢেলে বরফ রাখল অঞ্জনা।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ে গল্প করে ঘড়ি দেখল হরিমাধব। রাত ছুটো। অঞ্জনার গাঢ় নেশা হয়ে গেছে। এর মধ্যে এক ফাঁকে সে শাড়ি ছেড়ে কাফতান পরে এসেছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার। হরিমাধব বলল, 'এবার উঠতে হবে আমাকে। টিউব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি না পেলে হোটেলে পৌঁছাবো কী করে জানি না।'

'দাঁড়ান।' আমি ফোনে ট্যাক্সি আনিয়ে দেব। বসুন। উঠবেন না।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'ইণ্ডিয়াতে কোন পিছুটান নেই, এখানে হোটেলে আর কে বসে থাকবে?'

'ফিরতে তো হবে।'

'ফিরবেন, কিন্তু তার আগে আমার একটা উপকার করে যাবেন।'

'নিশ্চয়ই, বলুন কী করতে হবে।'

'ছুটো পনের থেকে পঁচিশের মধ্যে আমার কাছে একজন আসবে।'

'এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ। কারণ সে জানে তার আগে আমাকে পাওয়া যাবে না।'

'বলুন কী করতে হবে?'

'লোকটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি চাই না।'

'সেটা আপনি বলেছেন ওকে?'

'অনেকবার। কিন্তু প্রথমদিকে জনের ওপর রাগ করে ওর সঙ্গে কিছুদিন যে মেলামেশা করেছিলাম সেটাই কাল হয়েছে। ও কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ছে না। আমি এত ফাস্ট লাইফ চালাচ্ছি, তবু আমাকে খুঁজে বের করেছে।'

'তা বিয়ে করছেন না কেন?'

'অসম্ভব। লোকটার সঙ্গে আমার কোন মানসিক মিল নেই।' আর একটা স্কচ ঢালল অঞ্জনা, 'শুধু ভালবাসি বললেই ভালবাসা মনে তৈরি হয় না।'

'তা আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনাকে আমার ভাবী স্বামী সাজতে হবে।'

'সেকি?'

'কেন? আমাকে কি আপনারও ঘেন্না হচ্ছে?'

'আমারও মানে?'

'আমার বাবা করবেন।'

'আপনার জীবনধারা আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না, কিন্তু তাই বলে মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না। না, ঘেন্না করার কথাই ওঠে না।'

ঠিক তখনই বেল বেজে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে একটু টলে গেল অঞ্জনা। হরিমাধবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'ও এসেছে। দরজা খুলুন।'

'আমি?'

'হ্যাঁ।' অঞ্জনা হাসল, 'আর প্লিজ, এই জ্যাকেট-ট্যাকেট খুলে শুধু সার্ট পরে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করবেন, এত রাতে কাকে চাই? আমাকে চাইলে জানতে চাইবেন আপনি কে? ও যদি আপনার পরিচয় জানতে চায় তো বলবেন, আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

'খুব পীড়াপীড়ি করলে নিয়ে আসবেন।'

'ঠিক আছে।' তখনই আবার বেল বাজল। হরিমাধব জ্যাকেট

খুলে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে টের পেল তার ঠাণ্ডা লাগছে।

দরজা খুলতেই স্বাস্থ্যবান একটি লোককে অবাক হয়ে তাকাতে দেখল সে। হরিমাধব কায়দা করা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

'আনজানা। কিন্তু আপনি কে?'

'আমি ওর ভাবী স্বামী।' হরিমাধব হাসল, 'এত রাত্রে কোন মহিলাকে ডাকতে আসা যে ভদ্রতা নয়, তা নিশ্চয়ই কোন ইংরেজকে শেখাতে হবে না?'

লোকটা যেন বেদম ঘুষি খেয়েছে এমন মনে হল, 'আনজানা বিয়ে করতে যাচ্ছে! ওহো নো। আই কাণ্ট বিলিভ দিস। ও আমাকে এই সময়ে আসতে বলেছিল!'

'ওয়েল, জেন্টলম্যান, আমি কি এবার দরজা বন্ধ করতে পারি?'

'নো, প্লিজ, আমি একবার আনজানার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কেন?'

'আই অ্যাম নট গোয়িং টু এ্যানসার ইউ। ইউ আর নট ইয়েট—।' কথা শেষ না করে প্রায় ধাক্কা দিয়ে লোকটা যখন ভেতরে ঢুকল তখন হরিমাধব বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত! অঞ্জনা সেটা বলে দেয়নি। সে বেশ নার্ভাস হয়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হল অঞ্জনার ভাবী স্বামী বলার সময় তার বেশ ভাল লেগেছিল। ব্যাপারটা সত্যি হলে—! সে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে লোকটা ভেতরের ঘরে ঢুকে গেছে।

অঞ্জনার চিৎকার শোনা গেল, 'ওহো, নো, তুমি এখানে কেন?'

লোকটা পা ফাঁক করে দাঁড়াল, 'এই লোকটা কে? তোমার হবু স্বামী?

'ইয়েস।' বিছানায় আধশোয়া অঞ্জনা জবাব দিল।

'ইউ কাণ্ট ডু দ্যাট।'

'দ্যাটস মাই প্রব্লেম, তাই না?'

'নো। আই উইল নট এ্যালাউ ইউ টু ডু দ্যাট।'

'মাইণ্ড ইওর ওন বিজনেস। আই ডোণ্ট নিউ ইউ এনি মোর।'

'ফর গড্‌স শেক, হোয়াই ?'

'বিকজ আই ডোণ্ট লাভ ইউ। কাম অন, গেট আউট দিস প্লেস।'

'নোঃ।' লোকটা শরীর ঝাঁকাল। তারপর দুটো হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল অঞ্জনার দিকে। অঞ্জনা দুহাতে মুখ ঢাকল। তার শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে হরিমাধব চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও, নইলে বিপদে পড়বে।'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। হরিমাধবের দুটো হাত পকেটের ভেতরে এবং সেখানে পাউণ্ড আর রুমাল ছাড়া কিছু নেই। লোকটা কিছু ভাবল। তারপর মাথা নাড়ল, 'সরি। আমি ওকে মারতাম না, শুধু একটু স্পর্শ করতাম।' বলে হনহনিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল দরজা ঠেলে। হরিমাধব দ্রুত গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল। তবে নির্দোষ ধমকে যে লোকটা এমনভাবে চলে যাবে, তা সে ভাবতেই পারেনি: ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখল অঞ্জনা টেলিফোন করছে, কাউকে বাড়ির ঠিকানাটা জানাচ্ছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে অঞ্জনা বলল, 'আপনার ট্যাক্সি এসে যাচ্ছে মিনিট দুয়েকের মধ্যে। কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো জানি না। আমার একটা বড় সমস্যা আপনি সমাধান করে দিলেন।'

হরিমাধব হতবাক। সে বিপরীত ব্যবহার আশা করছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অঞ্জনা। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল আপনার ? অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন ?'

'আ-আমরা বন্ধু হতে পারি না ?'

'অফকোর্স, আমরা তো বন্ধু।'

'না, মানে—'

'দয়া করে বলবেন না আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান। কোন ভারতীয় ছেলে কুমারী মাকে স্ত্রী হিসেবে মানতে পারে না। তাই না ?' অঞ্জনা হাত তুলে হাই কাটালো, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। নিচে নেমে দেখবেন এই ব্লকের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

'অঞ্জনা, আপনি একবার ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারেন না ?'

'কেন ?'

'আপনার বাবাকে দেখতে।'

'মেয়েকে ফেলে ? অসম্ভব।' অঞ্জনা হাসল, 'কাল দেখা হবে। গুড নাইট।'

অতএব হরিমাধব নীচে নেমে এল। সত্যি একটা ট্যাক্সি সেই নির্জন রাত্রির রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ঠিকানা বলে উঠে বসতেই খুব ক্লান্ত লাগল শরীরটা। নিশুতি রাতের লণ্ডনের রাস্তা পেরিয়ে ভাড়া মিটিয়ে হোটেলে ঢুকে নিজের বিছানায় শরীর মেলে দিতেই জব্বর ঘুম চলে এল দামাল হয়ে।

ভোরবেলায় কেউ দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাকে বিছানা থেকে তুলল। হোটেলের কর্মচারী বলল, 'আপনার টেলিফোন, ইণ্ডিয়া থেকে।'

শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্যাসেজের পাশে রাখা টেলিফোন রিসিভার তুলল সে, 'হেলো।'

ওপাশ থেকে মালিকের গলা ভেসে এল, 'কিছু খবর আছে ?'

'আছে।'

'বলে ফেল।'

'উনি দেশে ফিরবেন না।'

'সেটা আমি জানি। নতুন খবর বল।'

'আজ্ঞে, ওঁর একটা বাচ্চা আছে, অথচ উনি বিয়ে করেননি।'

'আঃ, তারপরে কি হয়েছে বল !'

'আপনি এটা জানেন ?'

'আঃ, আমি একটা বড় ব্যবসা চালাই, তুমি আমার পয়সায় গিয়েছ, আর কি খবর ?'

'ওই বাচ্চার জন্যে দেশে ফিরবেন না তিনি।'

'কবে জানতে পেরেছ ?'

'আজই।'

'গুড। শোন, তোমাকে আমি স্যাক্ করলাম। যদি ওকে নিয়ে ফিরতে পার তাহলে চাকরি পাবে, নইলে নয়। গুড নাইট। ওহো,

বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেও আমার আপত্তি নেই। এখন যা পারো তাই করো।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

নিজেকে গাধা মনে হচ্ছিল তার। মালিক সব জানেন। জানতেন; তবু না জানার ভাণ করে তাকে লণ্ডনে পাঠিয়েছেন। কেন? মাথার ভেতরটা কাজ করছিল না তার। ঘরে ফিরে ভাল করে তৈরী হয়ে সে নিচে নেমে এসে ট্যাক্সি নিল।

এখন সকাল হয়নি। রাস্তায় লোক নেই। লণ্ডনে কুয়াশা প্রচুর। সে ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এসে দরজার পাশের বোতাম টিপল। টানা এক মিনিট। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল অঞ্জনা। রাগে বিরক্তিতে যেন সে ফেটে পড়বে। কিন্তু তার আগেই হরিমাধব কড়া গলায় বলল, 'যেমন তুমি 'তেমন' তোমার বাবা, দু'জনই সমান।' এমন কথা আশা করেনি অঞ্জনা, গলা তুলল সে, 'তার মানে?'

'চোপ্। একদম চেঁচাবে না। আমি তোমার বাবার চাকর নই!'

'তুমি এখন এখানে কেন? তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি বলে মনে করো না যে তোমাকে মাথায় উঠতে দেব।'

'আরে দূর! কে তোমাকে তোয়াক্কা করে। তুমি একটার পর একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করবে আর তাদের কাটাবে। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার প্রেমে পড়েছি?'

'আমি আমার বাবার কর্মচারীর সঙ্গে প্রেম করি না।'

'বললাম তো আমি সেটা আর নই।'

'তাই বলে প্রেম করব ভেবেছ?'

'কে ভেবেছে আমি? কক্ষণো না।'

'তাহলে কেন এসেছ?'

'জানি না। আমার মাথার ঠিক নেই। আচ্ছা চলি।'

'দাঁড়াও।'

হরিমাধব দাঁড়াল। অঞ্জনা হাসল, 'বাবা তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?'

'কি করে জানলে?' হাঁ হয়ে গেল হরিমাধব।

'অনুমান।'

'উনি ছাড়াবার কে? আমি ছেড়েছি।'

'গুড।'

'তোমাকে বুঝতে পারছি না। রেসের ঘোড়ার দৌড় বুঝতে পারি, তার অঙ্ক মাথায় আসে। কিন্তু তোমাকে নয়।'

'বসো। অনেক কথা বলব আজ আমরা।'

'সেই রাত্রে হরিমাধব হোটেলে রইল না। অতগুলো পাউণ্ড স্যুটকেসে পুরে সে এল অঞ্জনার ফ্ল্যাটে। সেই রাত্রে বাচ্চাটিকে এক রাত্রের জন্যে এনেছে অঞ্জনা। সে শুয়ে আছে বিছানায়। অঞ্জনা এবং হরিমাধব পাশাপাশি বসে। হরিমাধব বলল, 'একটা কথা দিতে হবে তোমাকে। এরপর আর কোন ছেলের প্রেমে পড়বে না।'

'কথা দিলাম।'

'তোমাকে বাচ্চাকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা।' অঞ্জনা সরে এল, 'আমাকে জড়িয়ে ধর।' এই সময় টেলিফোন বাজল। অঞ্জনা হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল, হ্যাঁ ভাল। ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। না। কোন প্রব্লেম নেই। হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে। কি বললে? আড়াই বছরের মধ্যে আমরা দেশে না ফিরি। ঠিক আছে। খুব ঘুরব এই সময়টা। ওর সঙ্গে কথা বলবে? এই হরি, 'বাবা।' রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে অঞ্জনা উঠে গেল। 'হেলো' বলতেই মালিকের গলা ভেসে এল, লুক, হরি, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার মেয়ে অমন কাজ করে বসায় ওকে দেশে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব ছিল। ওকে তাই বলা ছিল। তুমি গিয়েছ, খুব ভাল কথা। কালকেই বিয়েটা করে ফেল। আমি কাল সবকটা কাগজে তোমাদের বিয়ের খবর ছাপতে দিচ্ছি। আড়াই বছর বাদে যখন বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবে তখন সবাই ভাববে ও আমার বৈধ-উত্তরাধিকারী। বুঝলে? গুড নাইট। ওহো, তোমার চাকরি রইল, তবে প্রমোশন পাবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সামনে তাকাল হরিমাধব। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাতের পোশাক ঠিক করছে অঞ্জনা। হঠাৎ তার একটা গল্প মনে পড়ল। একজন ঘোড়া বিশেষজ্ঞ লিখেছেন। কলকাতার একটি বড় কাপের বাজিতে ষোলশ'মিটার এক মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডে ছোটার ক্ষমতা ধরত একটি ঘোড়া। অন্যান্যরা এক মিনিট একচল্লিশের নিচে ছুটতে পারবে না। অর্থাৎ সেই ঘোড়াটি জিতবে পাঁচ লেংথে। ট্রেনার একজন এ্যাপ্রেন্টিসকে দিল ঘোড়া চালাতে। লোকে বলল পুতুল চাপিয়ে দিলেও ঘোড়াটা জিতবে। হট ফেবারিট সেই ঘোড়া। রেস শুরু হবার আগে প্যাডক থেকে যাওয়ার মুখে ট্রেনার সেই এ্যাপ্রেন্টিস জকিকে, (যে জেতার আনন্দে ডগমগ হতে যাচ্ছে), ডেকে বলল, 'তুমি জিতবে না। রেস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে টানবে যাতে ঘোড়া পিছিয়ে পড়ে। ও যদি ছুটতে চায় তাহলে সামলে রাখবে যাতে না জেতে। এর জন্যে টার্ফ ক্লাব তোমাকে ছ'মাস সাসপেণ্ড করবে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। সব খরচ মালিক দেবে তোমাকে।'

আতঙ্কিত নবীন জকি মিনমিন করে জানতে চেয়েছিল, 'কেন? একে হারাবেন?'

'মালিক অন্য দরের ঘোড়ায় টাকা লাগিয়েছেন, তাই নিজের ঘোড়াকে হারাতে নির্দেশ দিয়েছে। ক্যারি আউট দ্য অর্ডার, মাই বয়।'

ঘোড়াটা হেরেছিল। পাবলিক ক্ষেপে গিয়েছিল। জকিকে শাস্তি দেওয়া হলেও সে টাকা পেয়েছিল চোরা পথে। কিন্তু জেতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

নিজেকে সেই নবীন জকির মত মনে হচ্ছে আজ হরিমাধবের।

স্রোতস্বিনী

এক বছর আগে স্বামীকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল সোহাগ। মাত্র দিন দশেক হাসপাতালে ছিল অবনী। এই দশদিন ঝড় বললে কম হয়, মনে পড়লে শরীর হিম হয়ে যায় এখনও। কলকাতার সেই হাসপাতালে ঈশ্বরের একজন পুত্র আছেন। সে সময় সোহাগের এমনই মনে হয়েছিল। কারণ যে মানুষটা আর বাঁচবে না বলে চেনাজানা ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন রায় দিয়েছিল তাকে উনি বাঁচিয়ে দিলেন।

অবনী স্কুলে পড়ায়। একদিন পড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সবাই ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসে। ধুম জ্বর চলে কিছুদিন। পাড়ার ডাক্তার জ্বর কমাতে না পেরে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল অবনীর রক্তে ক্যানসার হয়েছে। কান্নাকাটি সামলে সোহাগ ছুটেছিল কলকাতার হাসপাতালে। অবনীর বন্ধু সতীশ সেই সময় অনেক করেছে এ-ডাক্তার সে-ডাক্তার, সোহাগ তো কিছুই চিনতো না। সতীশই ঘুরে ঘুরে সন্ধান নিয়েছে। যে শুনেছে সে-ই বলেছে এই কেসে আর কিছু করার নেই।

সতীশ বন্ধু বটে কিন্তু বেশী মাখামাখি পছন্দ করত না অবনী। চল্লিশ পেরিয়েও বিয়ে থা' করেনি। রাত্রে একা একা মদ খায়। এমন লোক বাড়িতে যত কম আসে তত ভাল। বাইরের বন্ধুত্ব বাইরেই রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু অবনীর অসুখ হতে সতীশই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোহাগ আর তার ছেলে নবনীকে বলল. ভয় নেই, চেষ্টার শেষ দেখব।

লোকটা সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল, কিন্তু সেটা কাটতে সময় লাগল না। ওই সতীশই পার্ক স্ট্রীটের হাসপাতালের খবর আনল। সেখানে এই রোগের চিকিৎসা হয়। তিনজনে মিলে অনেক কষ্টে অবনীকে নিয়ে পৌঁছে গেল এক সকালে। টিকিট করে দোতলায়

উঠতেই মনে হয়েছিল কোননার্সিং হোমে এসেছে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে তখন বেজায় ভিড়। সবাই একসঙ্গে নিজেদের অসুখের কথা বলছে। সুদর্শন বৃদ্ধ ডাক্তার হাসিমুখে সব শুনছেন, জবাব দিচ্ছেন। অবনী ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এক শর্তে। কেনা রক্ত আনা চলবে না, নিজেদের রক্ত দিতে হবে আত্মীয়কে বাঁচাতে। তাতে টান থাকবে প্রাণের।

দশদিন রোজ দু'বেলা সোহাগ গিয়েছে সতীশের সঙ্গে হাসপাতালে। একটু একটু করে ডাক্তারবাবু আশার কথা বলেছিলেন। জ্বর কমে গেলে সতীশের হাত জড়িয়ে অবনী বলেছেন, আমাকে বাঁচাও সতীশ, আমি বাঁচতে চাই।

সতীশ কথা দিয়েছিল। সে চেষ্টা করবেই। দশদিনে আট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। দু'হাজার ঘরে ছিল, বাকিটা সতীশ দিয়েছিল। ওই দশদিনে একই সঙ্গে অবনীর জন্যে আশংকা আর সতীশ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গেল সোহাগের। কোন কোন দিন প্রয়োজনে দুপুরে থাকতে হয়েছে হাসপাতালে। তখন সতীশ তাকে খেতে নিয়ে গিয়েছে পার্ক স্ট্রীটের চিনে দোকানে। কোনদিন ওসব অভিজ্ঞতা ছিল না সোহাগের। সতীশ খুব গম্ভীর মুখে বসে থাকত, সঙ্গে হাঁটত। কোন রকম তরল কথা বলত না। শেষ পর্যন্ত সোহাগ বলেছিল, 'আপনার অনেক টাকা বন্ধুর জন্যে খরচ হচ্ছে, তার ওপর এসব—।'

সতীশ জবাব দেয়নি। সোহাগ আবার বলেছিল কথাগুলো। তখন সতীশ গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'আপনাকে খাওয়াতে আমার ভাল লাগছে। আজকাল খুব কম ভাল লাগে, লাগে না বললেই হয়, এটুকু থেকে বঞ্চিত করবেন?'

'আপনি বিয়ে-থা করেননি কেন?'

'করা হয়নি। তাছাড়া করে ফেললে সে কি রোজ আপনার সঙ্গে আসতে দিত?'

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল সোহাগের, কিন্তু সেই সঙ্গে যে ভাল লাগা ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাও সত্যি। মুখ নামিয়ে নিয়েছিল

সে। খাবার গলায় আটকে যাচ্ছিল কিন্তু সতীশ আর কথা বাড়ায়নি। শুধু কথা নয়, ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়নি তার।

বাড়িতে ফিরে বারো বছরের নবনীকে অকারণে জড়িয়ে ধরেছিল সোহাগ। এমন আদরে ইদানিং অভ্যস্ত নয় নবনী। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা কি বাঁচবে না মা?'

চমকে সোজা হয়ে সোহাগ জবাব দিয়েছিল, 'না, না। ডাক্তার-বাবু বলেছেন তোর বাবার শরীরে ওষুধ খুব ভাল কাজ করছে। বেঁচে যাবেই।'

'সতীশকাকুর জন্যে বাবা বেঁচে যাবে, না?'

'ভগবানের জন্যে রে। তিনিই সব করেন।'

দশদিনের পরে ডাক্তার অবনীকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে প্রতি মাসে একবার করে এখানে নিয়ে আসবে। আমি পরীক্ষা করব। এই চিকিৎসা তিন বছর ধরে চলবে। যে ওষুধগুলো লিখে দিয়েছি তা নিয়ম করে খাওয়াবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি দয়া করেন।'

বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে বেশ তাজা হয়ে উঠল অবনী। কাজে যোগ দিল। যারা বলেছিল বাঁচবে না তারা এবার বলল, নিশ্চয়ই ব্লাডক্যানসার হয়নি, অন্য কিছু হয়েছিল। প্রথম মাসে কলকাতায় ওকে এনে দেখিয়ে গেল সতীশ। ডাক্তার উন্নতি দেখে খুব খুশী।

সতীশ বাড়িতে রোজ আসছে, সোহাগের সঙ্গে কথা বলছে এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না অবনীর। সতীশের কাছে ধার হয়ে গিয়েছে অত টাকা, এটাও ভাল লাগছিল না। সে সতীশকে ডেকে একদিন বলব, 'তোমার টাকা কিভাবে শোধ করব—।'

'আমি তোমাকে শোধ করতে বলেছি? নিজের পরিবারের জন্য লোকে কি করে না? আমাকে যদি বাইরের লোক বলে মনে কর তাহলে অন্য কথা।'

হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি হল অবনীর। মনে যাই থাক সে মুখে কিছু বলল না। যতই তাজা ভাব দেখাক, ভেতরে ভেতরে সে বোঝে আগের মত নেই শরীরটা। ডাক্তার যেসব নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটি হল যৌনসম্পর্ক করা। এ ব্যাপারে অসুখের আগেই আগ্রহ কমে গিয়েছিল। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। সোহাগকে যেহেতু স্পর্শ করতে হচ্ছে না তাই সতীশ যদি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে খুশী থাকে তাতে তার আপত্তি করার কিছু নেই।

দ্বিতীয় মাসে অবনীকে তাড়া দিল সোহাগ কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসতে। সতীশ সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু যাওয়ার দিন সে খবর পাঠাল তার জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছে না। অবনী তাকে দেখে এসে বলল, 'নিজেই যাবো। এখন তো আর চলাফেরার কোন অসুবিধে নেই।'

অবনী চলে গেল। নবনী স্কুলে। সোহাগের মন ছটফট করছিল: লোকটা অসুস্থ হয়েছে অথচ অবনী দেখে এসে বলল না কেমন আছে। মানুষটা তাদের জন্যে এত করল আর তার অসুখের সময় চুপ করে থাকবে। হঠাৎ মনে হল অবনীর অসুখের সময় যেতে যেতে উদ্বেগ কমে গিয়ে এক ধরনের ভাল লাগা তৈরী হয়েছিল। সেইটে আর নেই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সতীশের বাড়ী বেশী দূরে নয়।

একটা বুড়ো চাকর নিয়ে সতীশ থাকে। চাকরটিকে সে চিনত। প্রয়োজনে সতীশ অনেকবার ওকে বাড়িতে পাঠিয়েছে। চাকর বলল, 'বাবুর খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না। আপনি একটু চলুন।'

সতীশ শুয়েছিল বিছানায়। চোখ বন্ধ। পায়ের শব্দেও চোখ খুলল না। কপালে হাত রেখে সোহাগ দেখল পুড়ে যাচ্ছে। চাকরকে বলে আর ন্যাকড়া এনে জলপটির ব্যবস্থা করল। মাথার পাশে বসে জলপটি দিতে লাগল। সতীশ কালো চোখ মেলে হাসল। সোহাগ জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর বাধালেন কি করে?'

'ঠাণ্ডা লেগে। কিছু না। সেরে গেলে ভাল হয়ে যাব।' তার পর হাসল, 'এখন আমার জ্বর কমে যাবে।'

একটু কাঁপুনি এল যেন শরীরে। সোহাগ ঠোঁট কামড়াল। বুড়ো চাকর ডাক্তার ডেকে আনল। তিনি ওষুধ দিলেন। এরকম জ্বর আজকাল খুব হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। তবে মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে।

ডাক্তার চলে গেল। বুড়ো চাকর গেল ওষুধ আনতে। আর সব কাজ নিজের হাতে করল সোহাগ। ঠিক এই সময়ে এ-বাড়িতে এল অবনী। এসে দৃশ্যটা দেখেও রাগ করল না। বলল, 'বাড়িতে ফিরে বুঝলাম তুমি এখানে এসেছ, তা কেমন আছে ও এখন?'

'জ্বর আছে।'

'বেচারা। ভাগ্যিস তুমি এসেছ।' কিছুক্ষণ বসে রইল অবনী। সে আসার পর থেকে সোহাগ আবিষ্কার করল তার মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

সতীশ ওই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতায় গিয়েছিলে?'

অবনী জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার কি বলল?'

'উন্নতি হচ্ছে।'

'বাঃ, খুব ভাল খবর!' সতীশ হাসল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ সোহাগকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল অবনী। পাশের ঘরে নবনী শোয়। তার দরজা আলাদা। সোহাগ বলল, 'শুয়ে পড়।'

অবনী শুনল না। মরীয়া হয়ে সে তার স্বামীত্ব প্রতিষ্ঠা করল। অনেক বাধা দিয়েছিল সোহাগ। ডাক্তারের নিষেধের কথা বলেছিল। অবনী জানিয়েছিল আজ নাকি সে ডাক্তারের অনুমতি পেয়েছে। পেতে পারে, কিন্তু সোহাগের মনে হয়েছিল অসুস্থ সতীশকে সেবা করতে দেখার

পর এই কাণ্ড করল অবনী। মন তেতো হয়ে গেল সোহাগের। আর সেই সঙ্গে অবনীর ওপর রাগ। পরদিন সে ইচ্ছে করেই গেল না সতীশকে দেখতে। অবনী বিকেলে জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশকে দেখতে যাওনি?'

জবাব দিল না সোহাগ। সেদিন রাত্রে অবনী তাকে স্পর্শ করল না।

পরের দিন সতীশ নিজেই এল। রুগ্ন শরীর নিয়ে তাকে আসতে দেখে রাগ করল সোহাগ। সতীশ হাসল, চা খেল, তারপর রিকশায় চড়ে ফিরে গেল। সেইরাত্রে আবার জোর-জবরদস্তি। কোনমতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ফোঁস করে উঠল সোহাগ, 'তুমি কি চাও? সতীশবাবু এ বাড়িতে না আসুক?'

'হঠাৎ সতীশের কথা?'

'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?'

'করি। তাই রোজ মনে করিয়ে দিতে চাই আমি তোমার স্বামী।'

ঘেন্নায় কথা বলতেও ইচ্ছে করল না সোহাগের।

বাক্যালাপ বন্ধ। সতীশ নিয়মিত আসে। তার সঙ্গে কথা বলে অবনী। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখে সোহাগ। যতটা সম্ভব। অবনী সম্পর্কে সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ল। সতীশ এসে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে। তখন কথা বলতেই হয়। আর মনে মনে শঙ্কিত হয় রাত্রে আক্রমণ হবে। কিন্তু ইদানিং অবনীর প্রায়ই জ্বর হচ্ছে। মাথা ঘোরে। অবনীকে ডাক্তার দেখানোর কথা বললে সে জানায় কলকাতার ডাক্তারবাবু বলেছে উন্নতি হচ্ছে, এটা নেহাৎই সাধারণ জ্বর।

সতীশের সঙ্গে সোহাগ কথা বলে না লক্ষ্য করেছে অবনী। এই নিয়ে সে রাগারাগি করে। আর এইটে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে সোহাগকে। তার মনে হয় অবনী তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। একদিন এক জোড়া সোনার বালা বিক্রী করে টাকা জমিয়ে রাখল সে। সতীশ এলে ধারটা শোধ করবে। তার মুখের ওপর বলে দেবে আর এ বাড়িতে না আসতে। বলে দেবে অবনীর মনের কথা।

কিন্তু সেই দুপুরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল অবনী। সেইসঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু বলছে মরে যাব, মরে যাব।

নবনীকে স্কুল থেকে ডাকিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে রিকশায় তুলে কলকাতার ট্রেন ধরতে ছুটল সোহাগ। যাওয়ার সময় সতীশের জন্যে টাকাটা নিতে ভুলল না।

কোনভাবে অবনীকে হাসপাতালে এনে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ছুটে গেল সোহাগ? ওই অসময়ে ডাক্তারবাবু রক্তের স্লাইড দেখছিলেন। চমকে উঠলেন কান্না শুনে, 'আমার স্বামীকে বাঁচান ডাক্তারবাবু?'

'তোমার স্বামী? কি হয়েছে তার?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু! এক বছর আগে ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম। অবনী, অবনী দত্ত। ব্লাডক্যান্সার পেশেন্ট।'

'ওঃ গড! এতদিন কোথায় ছিলে?'

'এতদিন আমি আসিনি, ও তো এসেছিল প্রতি মাসে।'

'মিথ্যে কথা। একবার এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। আর আসেনি।'

চমকে গেল সোহাগ, 'কি বলছেন! ও প্রতি মাসে আপনার কাছ থেকে ঘুরে গিয়ে বলত উন্নতি হচ্ছে।'

'তোমার স্বামী গত এগার মাস আমার সঙ্গে দেখা করেননি। আমি পই পই করে বলে দিয়েছিলাম প্রতিমাসে চেক্ না করলে আমি বাঁচাতে পারব না। নিশ্চয় স্বামীর প্রতি তুমি কেয়ারলেস। আমি কিছুই করতে পারব না।'

'আপনার কাছে ও আসেনি?' বিস্ময় তখনও কাটছিল না। 'আপনি সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেননি?'

'কোন্ নিষেধাজ্ঞা? তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।'

ডুকরে কেঁদে উঠল সোহাগ। এই কান্নার অর্থ ভুল বুঝলেন ডাক্তারবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় সে?'

'নিচে।' কাঁদতে কাঁদতে সোহাগ বলল, 'আজ দুপুরে আবার

ওইরকম হয়েছে, আপনি ওঁকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। ওকে ভর্তি করে নিন।'

'আজ কোন বেড খালি নেই। অসম্ভব। কাল নিয়ে এসো।'

'ওকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।' সোহাগ কাঁদছিল।

ডাক্তারবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'কে ব্লাড দেবে? আমি ফ্রেশ ব্লাড নেব। কেনা ব্লাডে কাজ চলবে না।'

'আমি দেব। আমার ছেলে দেবে।'

'তোমাদের গ্রুপ কি?'

'তা তো জানি না।'

ডাক্তার। নির্দেশ দিলেন ব্লাডব্যাঙ্ককে এদের রক্ত পরীক্ষা করতে। তারপর ছুটলেন পেশেন্টকে ভর্তি করতে। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল অবনীর সঙ্গে মা বা ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলছে না। ডাক্তার আবার এলেন। এসে রাগত গলায় বললেন, 'তোমরা লোকটাকে প্রায় মেরে ফেলেছ। এক বছর এই রোগে চিকিৎসা ছাড়া থাকা মানে মরে যাওয়া। তোমরা আপাতত রক্ত দাও, আমি অন্য ডোনারের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করিয়ে দিচ্ছি। দেখি কি হয়!'

রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে বসে ছিল ওরা ডাক্তারবাবুর প্রতীক্ষায়। নবনী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা মরে যাবে না তো?'

'কেউ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে আমরা কি করব বাবা!'

'বাবা আত্মহত্যা করেছে?'

সোহাগ জবাব দিল না। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। হঠাৎ নবনী উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মা, সতীশকাকু!'

চমকে মুখ তুলল সোহাগ। হন্তদন্ত সতীশ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'অবনী কোথায়? 'কেমন আছে এখন?'

নবনী জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবু বাবাকে ষ্ট্রেচারে করে ওপরে নিয়ে গেছে॥ আমরা রক্ত দিয়েছি কিন্তু রক্তের গ্রুপ মেলেনি।'

'সে কি! ঠিক আছে, তোমরা বসো। আমি যাচ্ছি, অবনীর আর আমার রক্তের গ্রুপ এক। কোন চিন্তা করতে হবে না।'

ব্লাড ব্যাঙ্কের দিকে চলে গেল সতীশ প্রায় দৌড়ে। নবনীর হাত আঁকড়ে বসেছিল সোহাগ॥ এবার ফিসফিস করে সে নবনীকে বলল, 'শোন্!'

নবনী বলল, 'কি?'

সোহাগ আরও স্বর নামাল, 'আমি যে অত টাকা সঙ্গে এনেছি কাউকে বলার দরকার নেই। কেউ যেন না জানে।

মাথার ভিতরে—

আমি খুব সুখী মানুষ ছিলাম। অল্পেই যারা দুঃখ পায় তারা তো সুখী। আমাকে কেউ দুঃখ দিত না। হেনারও। বরং রাগ হলে অথবা নিজের তৈরি অক্ষমতার কারণে আমিই অন্যের দুঃখের কারণ হতাম।

ওই সময় রাত্রে বা দিনে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেই ঘুম আসত। হেনা বলত, তোমার সুইচটেপা ঘুম। আলো বোধহয় তার চাইতে দেরিতে জ্বলে। সে বড়ো সুখের সময় ছিল যখন আমি চাইতাম হেনা আমার সুখ দুঃখের ব্যাপারে সবসময় সজাগ থাকুক। প্রেম ভালবাসা এবং অবশ্যই সহ্যশক্তি নিয়ে।

কিছুকাল আগে আমার মাথার ভেতরে একটা চিনচিনে বেদনা তৈরি হয়েছে। চলতে ফিরতে, মানে যতক্ষণ জেগে থাকি, ব্যথাটা জানান দিয়ে যায়। ব্যথা উপশমের যে সব বাজার-চলতি বড়ি আছে তার একটাও বাদ দিইনি কিন্তু কমার বদলে সেটা বাড়তেই লাগল। ডাক্তার প্রেসার মেপে বললেন আমার বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। তিনি ওষুধ দিলেন অথচ তাতে কোন কাজ হল না।

মাথার ভেতরে বেদনা শুরু হবার দিন সাতেক বাদে রাত্রে আর ঘুমই এল না। রাত্রে ঘুম না এলে, আমার মত সুখী মানুষের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। অতএব আমি আর সুখী থাকলাম না।

ব্যাপারটা টিউমার, এমন আন্দাজ করে ডাক্তার এক্সরে করতে বললেন। যেদিন প্লেট নিতে গেলাম সেদিন এক আজব ব্যাপার ঘটল। সেই ক্লিনিকের ডাক্তার সন্তর্পণে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বললেন, 'আর একবার এক্সরে করতে হবে।'

আমি খুব বিরক্ত হলাম। একটা কাজ কেন এরা একবারে করতে পারে না? ডাক্তার বললেন, 'আপনার এক্সরে প্লেটে টিউমার নেই। যেটা আছে সেটা যে কি, তা আমি বুঝতে পারছি না বলে আর একবার করব।'

উনি আমাকে আলোর বিপরীতে প্লেটটাকে রেখে দেখালেন। মাথার মাঝখানে কিছু একটা, আমার মনে হল, পোকা গোছের কিছু ডানা মুড়ে বসে রয়েছে। শুঁয়ো পোকা প্রজাপতি হতে যাবার শেষ মুহূর্তে যেরকম আদল নেয়, অনেকটা সেইরকম। জিনিসটা যাই হোক ওটি জন্মাবার পর থেকেই আমার এই দুঃসহ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অপারেশন করে ওটাকে বাদ দিলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব। ছেলেবেলায় গল্প শুনতাম মাথার ভেতরে কেন্নো ঢুকে পিত্বে ডিম পাড়ে বাচ্চা দেয়। এই এক্সরে প্লেট না দেখা পর্যন্ত ভাবতে পারতাম না আমি মাথার ভেতরে পোকা নিয়ে বাস করছি।

শহরের বড় ডাক্তারও অপারেশনের কথা বললেন।

সারাটা রাত চুপচাপ ভাবলাম। যন্ত্রণা সামলে যতক্ষণ ভাবা যায় আর কি। এই অপারেশন মানে অনেক হাজার টাকা। কেউ মুখে না বললেও বুঝতে পারছি বাঁচার সম্ভাবনা আধাআধি। টাকা খরচ করেও মরে যাওয়ার কোন মানে হয়। এবং ভোরবেলায় আবার মনে হল এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ঢের যুক্তিযুক্ত।

আত্মহত্যার চিন্তাটা আসতেই একটা দারুণ ঘটনা ঘটল। বেদনাটা যন্ত্রবলে উধাও হয়ে গেল যেন। আমার মাথায় আর কোন কষ্ট নেই। আমি মাথাটা টিপলাম। কি হালকা লাগছে। আনন্দে হেনাকে ফোন করলাম। ও গম্ভীর গলায় বলল, তোমার শরীর কি আরও খারাপ হয়েছে? ছাখো, আমি তোমার কারণে এমনিতেই প্রচণ্ড টেনশনে আছি। আমার আর টেনশন বাড়িও না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলছ তুমি?'

'তোমার মাথার ভেতরে একটা কিছু পাওয়া গিয়েছে যেটা যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর এখন তুমি বলছ যন্ত্রণা নেই। মানসিকভাবে তুমি সুস্থ তো?'

'হ্যাঁ। আমি তোমার জন্যে বেঁচে আছি হেনা। তোমার সঙ্গে বাঁচতে চাই। আর আমার অপারেশনের দরকার হবে না।' কথাগুলো শেষ করতেই যন্ত্রণাটা ফিরে এল। আমি কোনরকমে রিসিভার

নামিয়ে রাখলাম। এটা কি হল? পোকাটা কি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল? নাকি অসাড় হয়েছিল। যন্ত্রণাটা প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ভাবলাম আত্মহত্যা না করে উপায় নেই। আমি কিভাবে আত্মহত্যা করব? এই ভাবনাটা শুরু হওয়ামাত্র কর্পূরের মত যন্ত্রণাটা উধাও হয়ে গেল।

যেভাবে মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল সেইভাবেই প্রায়-সত্যটাকে আবিষ্কার করলাম আমি। যখনই আমার মাথায় আত্মহননের ভাবনা আসে তখনই যন্ত্রণা উধাও হয়। যেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি অমনি সেটা ফিরে আসে। যদি ওই পোকাটা আমার যন্ত্রণার কারণ হয় তাহলে বলতে হবে তার বোধশক্তি আছে। আত্মহত্যা করলে তার অস্তিত্ব ধ্বংস হবে। তাই সে ভীত হয়। নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখে। আমার আর কষ্ট থাকে না। কিন্তু যেই সে জানতে পারে আমি বাঁচার স্বপ্ন দেখছি অমনি সে পুষ্ট হতে চায়, বেদনাও শুরু হয়।

অতএব এখন অবস্থাটা এমন দাঁড়াল, বেদনামুক্ত হতে হলে আমাকে আত্মহত্যার কথা ভাবতে হবে। আজকাল যতক্ষণ জেগে থাকি ততক্ষণ আমার বেদনা থাকে না। ঘুমোলেই সেটা ফিরে আসে। কারণ মানুষ ঘুমিয়ে কিছু ভাবতে পারে না। ঘুম ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে?

আত্মহত্যার কথা দিনরাত ভাবতে ভাবতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। অথচ এটা না ভেবেও আমার উপায় নেই। মানুষ কত রকমের কাণ্ড করে মরতে পারে? বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে, ব্লেডে হাতের শিরা কেটে, ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, বাসের তলায় পড়ে, নদীতে ডুবে গিয়ে। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল এর কোনটাই খুব আরামদায়ক নয়। আর যেহেতু আমি খুব সুখী ছিলাম তাই মরার সময় অনর্থক কষ্ট করতে ইচ্ছে হল না। অতএব আমি হেনার কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে বললাম, 'হেনা, একটা উপকার কর, যাহোক একটা উপায় বল যাতে আমি সুখে আত্মহত্যা

করতে পারি।' হেনা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। যেন এমন অদ্ভুত অনুরোধ সে কখনও শোনেনি। সে হেসে বলল, 'পাগলামো করো না।'

আমি তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। ওর মনে হল ব্যাপারটা আমার মানসিক। ওর অনুরোধে মনের ডাক্তারদের কাছে গেলাম। তাঁরা আমাকে নিয়ে নানান পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলেন যে, পোকাটা আমার শত্রুতা করছে। এবার হেনা গম্ভীর হয়ে গেল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। নিজস্ব পুরুষ আত্মহত্যা করবে এটা কোন নারী মেনে নিতে পারে।

কিন্তু আমি কিইবা করতে পারি। আত্মহত্যা করব, এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিধা নেই।

কিন্তু মুস্কিল করল এই হেনাই। এই নারী আমায় ভালবেসেছিল। এক সময় ওকে অনেক পুরুষ কামনা করেছিল। রাজেন্দ্রাণীর মত হেনা আমার দাওয়ায় এসেছিল।

আত্মহত্যা করলে আর হেনাকে দেখতে পাব না, এই ভাবনাটা আমি সহ্য করতে পারছি না। অতএব শেষ পর্যন্ত হেনাকেই বললাম একটা উপায় বের করতে যাতে আমি সুখে আত্মহত্যা করতে পারি। অথচ হেনা বলল, 'পাগলামি করো না।' রাত্রে একা শুয়ে হঠাৎ মনে হল, আমি কি চাইছি হেনাও আমার সঙ্গে আত্মহত্যা করুক? আমি না থাকলে হেনাও থাকবে না এমন চিন্তা কি আমার অবচেতনে এসেছে? লজ্জায় পড়ে গেলাম। হেনাও যদি তাই ভেবে থাকে। হেনা মারা গিয়েছে, ওর সুন্দর শরীর চিতায় জ্বলছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতেই কুঁকড়ে উঠলাম। এ আমি সহ্য করতে পারব না। মরে গেলেও না। ওকে আমি বিয়ে করতে পারিনি। কিংবা বলা যায় ও আমায় বিয়ে করতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতাকে মানতে হয়েছে। শুধু ভালবাসা বেসে যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য জীবন নেই। আর এখন তো বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ের পর ওকে বিধবা করে রেখে যাওয়ার মত কাজ আমি করতে পারি না। কিন্তু হেনাকে ছেড়ে আমি থাকব কি

করে ? চোখ বন্ধ করলেই ওর পদ্মের মত মুখ ভেসে ওঠে।

বিকেলবেলায় ভাবনাটা মাথায় এল। ভাবনা এবং যন্ত্রণা আজকাল বেশ চমৎকার পরস্পরকে মেনে নেয়। আমি একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ কিনে ফেললাম। কোথায় যেন পড়েছিলাম খালি সিরিঞ্জে হাওয়া পুরে ধমনীতে সেই হাওয়া ঢুকিয়ে দিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। তেমন দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে কোন ডাক্তারের পক্ষে ব্যাপারটা ধরা অসম্ভব হয়ে উঠবে। মনে হবে হার্ট অ্যাটাকড্ হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলায় হেনাদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম সে নেই। এমন কখনও হয় না। যেখানেই যাক সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে সে। বাড়িতে অপেক্ষা না করে কাছের বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম। যে বাসে হেনা ফেরে সেগুলোর দিকে সাগ্রহে তাকাচ্ছি। এইবার অন্য দুশ্চিন্তা হল। হেনা অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো ? আমার কথা ভেবে বেচারা তো সবসময় টেনশনে আছে। আর তা থেকে প্রেসার, মাথা ঘুরে পড়া, কিছু একটা ঘটতে তো পারে।

নটা বাজল তবু হেনার দেখা নেই। এরমধ্যে ওর বাড়ির দরজায় দুবার গিয়ে দেখে এসেছি। এমন হতে পারে আমি লক্ষ্য করিনি আর সে আমারই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা হয়নি। সাড়ে নটা নাগাদ, কি করব বোঝার মত অবস্থাও যখন নেই তখন ট্যাক্সিটা আমাকে ডিঙিয়ে থামল হেনার বাড়ির সামনে। দ্রুত ছুটে যেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। হেনা একা নামছে না। অন্ধকার ওখানটায় ছড়ানো বলে সঙ্গীকে ঠাওর না করলেও শক্ত সমর্থ যুবক বলেই মনে হচ্ছে। ভাড়া মিটিয়ে হাসতে হাসতে ওরা বাড়ির দিকে যাচ্ছে। যুবকটি কে ? আত্মীয় ? বন্ধু তো হতেই পারে না। আমি ছাড়া কোন পুরুষকে হেনা বন্ধু হবার সুযোগও দেয়নি যে বাড়িতে আসতে পারে। তাহলে ? কুল কুল করে ঘামতে লাগলাম।

অথচ আমি ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। এমনকি, হেনার দরজায় নক্ করতেও না। জানলায় আলো জ্বললো। ওটা হেনার বসার ঘরের

জানলা। যুবক নিশ্চয়ই বসার ঘরে বসে গল্প করছে। কি এমন গল্প ?

ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার নারী কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলছে বলে আমি তার কাছে যেতে পারছি না।

আমার চোখের সামনে হেনার বসার ঘরের আলো নিভল। সেই যুবককে একটু এগিয়ে দিয়ে গেল হেনা। আমি স্পষ্ট শুনলাম যুবক বলছে, 'খুব ভাল কাটল আজকের সন্ধ্যে।' হেনা হাসল, 'আমিও রোজ এত টেনশনে থাকি, আজ হালকা ছিলাম।'

যুবক জিজ্ঞাসা করল। 'কবে দেখা হচ্ছে ?'

'দেখা যাক।' আলতো হাসল হেনা। তারপর ফিরে গেল নিজের ঘরে। একা।

শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেলাম আমি। আমার মস্তিকে যেহেতু পোকাটাও নিষ্ক্রিয় ছিল সেইহেতু সাড়া ছিল না। আমি দেখলাম হেনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। হায়, এত রাতেও হেনার দরজা ভেজানো। খুব খারাপ লাগল। এত অন্যমনস্ক কেন মেয়েটা! দরজাটা বন্ধ করা উচিত ছিল। একা থাকে, দিনকাল খারাপ।

ঠেলতেই পাল্লা খুলে গেল এবং আমি অন্ধকার ঘরে পৌছলাম। আর সেই গভীর অন্ধকার থেকে হেনার হাত উঠে এল, 'আলো জ্বেলো না।'

আমি চমকে উঠলাম। আমিই যে এসেছি বুঝল কি করে হেনা ? ও কি আমাকে রাস্তায় দেখেছে ? আমার জন্যেই কি দরজা ভেজিয়ে রেখেছিল খিল না তুলে।

'কি হয়েছে তোমার ?' প্রায় ভুতুড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

'কিছু না।' ঠাণ্ডা মাখামাখি ওর স্বরে।

প্রায় হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার টেনে বসলাম। এবং বসতেই হেনা বলল 'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাকে একা থাকতে দাও।'

'কি হয়েছে তোমার, হেনা ?'

'কিছুই হয়নি। কিছু একটা হলে তো বেঁচে যেতাম।'

'যেমন ?'

'কত কি। অফিস থেকে বের হবার সময় গাড়ি চাপা পড়তে পারতাম, যে লোকটি এসেছিল, সে আমাকে একা পেয়ে রেপ করে যেতে পারত। আজ প্রায় বারো বছর পরে যাকে ফোন করেছিলাম, সে এই রাত্রে আসতে পারত।'

'কাকে ফোন করেছিলে!'

'জয়ন্তকে।'

'জয়ন্ত! হেনা ?' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'চেঁচাচ্ছ কেন ? জয়ন্ত তো আমার জীবনে প্রথম পুরুষ।'

'কিন্তু তাকে তো তুমি ঘেন্না কর। কি প্রচণ্ড প্রতারণা করেছে সে তোমাকে। বারো বছর ধরে লোকটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাওনি তুমি!'

'ঠিক। কিন্তু এটাও সত্যি যে আজ ওকে ফোন করেছিলাম।'

'কেন ?'

'জানি না। কিছু একটা হোক আমার, সেই জন্যেই হয়তো।'

'এই ছেলেটি কে ?'

'পরিচিত। প্রায়ই বলত বাড়িতে আসবে। এতদিন পাত্তা দিইনি। আজ নিয়ে এলাম। রেস্টুরেন্টে খেলাম। কিন্তু বদলে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়ে গেল।'

'কি করে ?'

'একই কথা বলে। যে কথা একসময় জয়ন্ত বলত, যে কথা তুমি বল সেই একই কথা। আমি আর পারলাম না। উঠে আলো জ্বাললাম। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মুখ ঢাকল হেনা, 'আঃ, বললাম আলো জ্বেল না। আমার মাথা ছিড়ে যাচ্ছে।'

আমার বুকের ভেতর অন্য কেউ কথা বলল যেন, 'কখন থেকে ? ওষুধ খেয়েছ ?'

'ওষুধে কিছু হবে না। এটা ঠিক সেই ধরনের মাথা ধরা নয়।'

'তবে ?'

'জানি না। মাথার ভেতরে সারাক্ষণ ঝ্রিমি ঝ্রিমি শব্দ। হাটতে গেলে মাথা ঘোরে। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা।'

'হেনা!'

'কি?'

'তোমার ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'কেন?'

'আমারও এমন হয়েছিল।'

'দূর। এখন তুমি যাও।'

'তুমি এমন করো না হেনা।'

'কি করেছি? হেনা উঠে দাঁড়াল, 'আমি জয়ন্তকে বলেছি যত রাত হোক এখানে আসতে। ও এলে তোমার ভাল লাগবে না।'

'জয়ন্ত আসবে?'

'প্রস্তাবটা করামাত্র ও লাফিয়ে উঠেছে। ওর জীবনে যে সব নারী এসেছে আমি এতদিন তাদের থেকে আলাদা ছিলাম। আজ ফোন করা মাত্র এক হয়ে গেলাম।'

'ও এত রাত্রে এলে বাড়ি ফিরবে কখন?'

'না ফিরতে পারলে ফিরবে না।'

'হেনা!'

'আঃ এমন করো না। আমি তোমার সম্পত্তি নই। বিষ খেতে পার, রেল লাইনে মাথা পেতে দিতে পার, গলায় দড়ি দিতে পার: আত্মহত্যার যে কোন রাস্তা বেছে নিতে পার যখন তুমি, তখন আমিই বা পারব না কেন? তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। প্লিজ চলে যাও।'

'তোমাকে আমার ঘেন্না লাগছে হেনা।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম।

'গুড, এই তো চাই।'

'আর কোনদিন তোমার কাছে আসব না।'

'সেই সুমতি হোক।'

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে এলাম ওর বাড়ি থেকে। প্রচণ্ড ক্রোধ এখন মাথার ভেতর পাক খাচ্ছে। আমার

স্থির বিশ্বাস, জেনেশুনে হেনা এই কাণ্ডটি করছে। এ তো স্রেফ আত্মহত্যা। হেনাকে মানায় না। .বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের শেষ বাসগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে। এই সময় ট্যাক্সিটা এল। দরজা খুলে যে লোকটা নামল তাকে চিনতে অসুবিধে হল না। জয়ন্ত। টাকা গুনে ভাড়া দেওয়ার সময় মনে হল ওর পা'দুটো ঠিক থাকছে না। জয়ন্তকে চিনিয়েছিল হেনাই। রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানে। দূর থেকে। সেদিন ওর সঙ্গে অন্য নারী ছিল। বিয়ের বাঁধনে ধরা দেওয়ার পাত্র নয় জয়ন্ত তাই আজও অবিবাহিত। সব নারীকে সে জয় করতে পেরেছে শুধু হেনা ছাড়া। এখন জয়ন্ত শিস দিতে দিতে হেনার বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। এই এত রাত্রে। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে লোকটাকে বেদম মার দিই। কিন্তু যার নিজের পায়ের তলায় জায়গা নেই, সে তো কিছুই করতে পারে না। হঠাৎ মনে হল. বারো বছর বাদে ওরা কি কথা বলতে পারে?

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সব বাস বাড়ি ফিরে গিয়েছে। সব বাড়ির আলো নিভে গিয়েছে। খেয়াল হতেই ধীরে ধীরে হেনার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোথাও আলো জ্বলছে না। জানলাগুলো অন্ধকার। জয়ন্ত ওখানে আছে? হেনার সঙ্গে? নাকি জয়ন্ত ফিরে গিয়েছে আমি দেখতে পাইনি। বুকের সবকটা পাঁজর যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

প্রায় শেষ রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল। এত রাত্রে কে? কথা বলার শক্তি ছিল না, ইচ্ছাও। কিন্তু যন্ত্রটা বেজেই চলেছে। অলস হাতে রিসিভার তুললাম, কথা বললাম না। আর ওপাশ থেকে ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়ল প্রশ্ন। 'ওঃ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে?'

হেনা। আমি জবাব দিলাম না।

'কথা বলছ না কেন? আমি পনের মিনিট পর পর ফোন করছি তোমাকে? হ্যালো। কথা বল। আমি আর পারছি না।' কেঁদে উঠল হেনা।

'কি পারছ না!'

'আত্মহত্যা করতে।'

'জয়ন্তবাবু কোথায়?'

'আমি ঢুকতে দিইনি।'

'মানে?'

'তুমি চলে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল, আমার মরে যাওয়াই উচিত। তোমার মাথার পোকার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছ। আর তার রাস্তা আমাকেই বলে দিতে বলছ। আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারিনি। পরিচিত ছেলেটিকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেয়েছি, বাড়িতে নিয়ে এসেছি আর বমি পাক খেয়েছে শরীরে। জয়ন্তকে ফোন করেছিলাম রাগে অপমানে জেদে। নিজেই খাল কেটে কুমির ডেকে নিয়ে এলাম। ও এল মদ খেয়ে। ওর গলা কানে আসামাত্র আমার বমি পেয়ে গেল। বেসিনে সেটা উগরে দিয়ে হাঁফাতে লাগলাম। ও শব্দ করতে করতে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। তুমি রেললাইনের তলায় মাথা দিতে চাওনি কারণ সেটা বীভৎস ব্যাপার। তুমি সুখে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে। জয়ন্তকে দরজা খুলে দিলে আমারও সুখ থাকত না আত্মহত্যায়। শোন, আমি আত্মহত্যা করতে চাই।' হেনার গলা থেকে কান্না মুছে গেল।

আমিও। সেই জন্যে আমি একটা সিরিঞ্জ কিনেছি। বাতাস টেনে নিয়ে সেটা ঠিকঠিক জায়গায় ঢুকিয়ে দিলেই হৃৎপিণ্ড অচল হয়ে যাবে। সুখে মৃত্যু আসবে। আমি তৈরি।'

'চমৎকার। কিন্তু একটু অপেক্ষা করবে। প্লিজ।'

'কেন?'

'আমরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করব।'

'কি করে?'

'একটু আলো ফুটুক। আমি তোমার কাছে আসছি।'

বুক হালকা হয়ে গেল। বালিশে মাথা রাখলাম। এবং কি আশ্চর্য, অনেক, অনেক দিন বাদে ঘুমিয়ে পড়লাম। পায়ের তলা

থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুম গড়াতে লাগল। সেটা থেমে গেল সকাল ছটায় কলিং বেলের শব্দে। ঘুম ভেঙে হতভম্ব হলাম। পোকাটা আমাকে ঘুমোতে দিল কেন? ঘুমন্ত অবস্থায় তো আমি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে পারি না। আবার কলিং বেলের আওয়াজ হতেই টলতে টলতে উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। ঝড়ো চেহারা নিয়ে হেনা ঢুকল। দরজা বন্ধ করল। এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ধীরে ধীরে খাটের কাছে গিয়ে সিরিঞ্জটা বের করলাম, 'এসো।' হেনা এগিয়ে এল।

'হৃৎপিণ্ডে বাতাস চাই, ধমনী দিয়ে শিরা দিয়ে বুদ বুদ পৌঁছালেই—।' হাত থেকে সিরিঞ্জ টেনে নিয়ে ছুড়ে দিল হেনা, 'তার জন্যে এটার কি দরকার? তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর, গ্রহণ কর, সারাজীবনের জন্যে।'

'আমরা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম হেনা।' ওর আলিঙ্গনে আমি ডুবে যাচ্ছি।

'করছি তো। দুজনে দুজনের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ নিয়ে সারাজীবন একসঙ্গে থাকব।' সুখের এমন আত্মহত্যা আর কিছুতেই তো হবে না গো। তুমি সুখে মরতে চাওনি, বল?' আমি মরলাম।

—

ভূমিকা বদল

মধ্যরাত্রে ঈশ্বর দর্শন হল গোপীনাথের। রাত এগারটায় তিন পেগ হুইস্কি পান করে সে বিছানায় গিয়েছিল। মধ্যরাত্রে তার ঘুম ভাঙ্গার কথাও নয়, ভাঙেও না। সকাল আটটায় গোপীনাথের স্ত্রী সাতবার ঠেলাতে, তার ঘুম ভাঙ্গে।

মধ্যরাত্রে একটি বিশাল মশা গোপীনাথের কপালে হুল ফোটাল। মশাটির সাইজ প্রায় বোলতার মত। বিষ খুব তেজী। প্রথমে ব্যথা, পরে জ্বালা এবং সেই জ্বালা এমন তীব্র যে ঘুম ভাঙ্গতে গোপীনাথ কপালে প্রাণপনে চড় মারল। ঘুম ভাঙল এবং সে আবিষ্কার করল তার হাত চটচটে হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ আঙ্গুলের মাঝখানে কি যেন সামান্য নড়ে ওঠার চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে গোপীনাথ হা হয়ে গেল। হাত রক্তাক্ত কিন্তু মশাটি তখনও মরে নি। এত বড়, বিশাল সাইজের মশা জীবনে ছাখেনি সে, বোলতা নয়, অবিকল মশা।

চট করে সেটিকে টেবিলে একটি কাগজের ওপর রেখে বেসিনে হাত কপাল ধুয়ে ডেটল লাগাল গোপীনাথ। জ্বালা কমছে না, এবং ইতি মধ্যে কপাল ফুলতে আরম্ভ করলো। সে ভীত হল। রাত এখন ছুটো। কোন ডাক্তারকে দেখানোর উপায় নেই। ফুলতে ফুলতে কপাল চোখ ঢাকছে। এবার মনে হচ্ছে গালের ওপরও তার প্রভাব পড়বে। গোপী-নাথ দেখল তার স্ত্রী আত্মসুখে নিদ্রা যাচ্ছে। কোন হুঁসই নেই। সাধারণত অন্যকে বিরক্ত করতে চায়না গোপীনাথ। স্ত্রীর যেহেতু নিজস্ব শরীর এবং মন আছে, তাই তাকে অন্য ভাবতে অসুবিধে হল না। গোপীনাথ টেবিলের সামনে ফিরে এসে দেখল বিশাল মশাটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। হাতের চাপে তার বাঁ পা ভেঙেছে। সিম্পল ফ্যাকচার, ডানায় চোট লেগেছে। কিন্তু আর সব সামান্য চেপ্টে গেলেও তেমন জখম হয়নি। গোপীনাথকে দেখে হুল উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

যদিও সেই দাঁড়াতে গিয়ে বা দিকে সামান্য কেৎরে পড়ল। বোলতার মত মশা শুধু অরন্তদেবের কমিকসে পড়েছে গোপীনাথ। মশাটার এখন কিছুই করার নেই, আতঙ্কে আক্রমণ করার ভঙ্গী করছে কিন্তু ক্ষমতা যে নেই তা বুঝতে দিতে চাইছে না।

গোপীনাথ আবিষ্কার করল মশার শরীরের ভেতরের কিছুটা অংশে লাল আভা দেখা যাচ্ছে। তার রক্তের যে অংশ পেটে গিয়েছিল তাই দেখতে পাচ্ছে সে এখন। পেট ভর্তি করে খেতে পারে নি মশাটা। গোপীনাথ আঙ্গুল বাড়িয়ে দেওয়া মাত্র ছুট করে হুল এগিয়ে ফোটাতে চাইল মশাটা। চটপট আঙ্গুল সরিয়ে নিল সে।

গোপীনাথ স্থির করল এই মশাটাকে মরতে দেওয়া চলবে না। কাজে অকাজে এর সাহায্য লাগতে পারে। একটা কাঁচের কৌটায় সে টপ করে মশাটাকে ভরে ফেলল। কৌটার ঢাকনায় আগে থেকেই কয়েকটা ফুটো ছিল। ভেতরে বাতাস যাবে স্বচ্ছন্দে। মশাটাকে কব্জা করতে পেরে মনে বেশ বল এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যারা তাকে এতদিন অকারণে অবহেলা করেছে তাদের শায়েস্তা করা যাবে। কিন্তু মশাটাকে না খাইয়ে রাখলে কতদিন বেঁচে থাকবে, একটা মশার প্রান কতদিন থাকে? ফাঁপড়ে পড়ল সে। পাশ ফিরে তাকাতেই স্ত্রীর দিকে নজর পড়ল। দিনরাত তাকে খোঁটা দেয়, ওর জীবন নাকি তার হাতে নষ্ট হয়েছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক ধরণের ঝাঁকুনি এল। এই ভদ্রমহিলা প্রায়ই বলে থাকেন স্বামী এবং স্ত্রীর সবকিছু সমান ভাবে পাওয়া উচিত। অথচ নেবার সময় নিজেরটা আগে ভাগে নিতে এর জুড়ি নেই। তাহলে এই যে তার কপাল মুখ ফুলেছে ওরও তো একই রকম ফোলা উচিত। গোপীনাথ কৌটোটা সন্তর্পনে তুলে স্ত্রীর মাথার পেছন দিকে চলে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সেটি কপালের কাছে নামিয়ে ঢাকনাটা খুলতেই মশাটা পড়ে গেল স্ত্রীর কপালের উপর।

শরীরটাকে সামলাতে একটু সময় লাগল।

গোপীনাথ দেখল মশাটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে কপালের উপর

এবার সে তার হুল সোজা করল, নামিয়ে আনল স্ত্রীর কপালের চামড়ার ওপর। এবার নির্ঘাৎ ঢোকাবে হুলটা, গোপীনাথ টানটান হল। কিন্তু চামড়া পর্যন্ত হুল নামিয়েই মুখ সরিয়ে নিল মশাটা। মাথা ঘুরিয়ে সে গোপীনাথকে খুঁজে সেদিকে তাকিয়ে রইল। গোপীনাথ হতভম্ভ। মশা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করতেই পাশ ফিরল স্ত্রী। আর পতঙ্গটি পড়ে গেল একপাশে। আবার কাঁচের কৌটায় খপ করে সেটাকে পুরে ফেলল গোপীনাথ। তারপর কৌটোটাকে চোখের সামনে এনে মশাটাকে দেখল। খুবই বিমর্ষ লাগল ওটাকে। সে কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছিল না পতঙ্গটা স্ত্রীকে কামড়াল না কেন? একটা ব্যাপার ঠিক, সুযোগ পেলেই এ ব্যাটা তাকে কামড়াবে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে তাকেই আক্রমণ করতে সবার উৎসাহের শেষ নেই। অফিসে মালিক, বাড়িতে স্ত্রী এমন কি মশা। আর এইসব আক্রমণকারীরা নিজেদের আক্রমণ করে না। একবার দুর্ঘটনাক্রমে মালিকের সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সে। দুজনের মুখে কি হাসি, গলার স্বর শুনে বোঝা যায় না যে অন্য সময় তার সঙ্গে ওরা কি গলায় কথা বলে। যাকে বলে গদা-গদ। সে এক পেগ হুইস্কি খেলে স্ত্রীর মুখ হাঁড়ি হয়ে যায় আর মালিক এক বোতল খায় শুনেও বিকার হল না। এই তো অবস্থা। মশা মালিক কিংবা বসকে কামড়াবে না।

মনে ধিক্কার এল গোপীনাথের। একটা মশা পর্যন্ত তার শত্রু। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মধ্যরাত্রে পথে নামল। তার এক নম্বর শত্রু স্ত্রী, সবসময় সহ্য করছে তাকে। দুনম্বর মালিক, সে অযোগ্য প্রমাণিত হলে লোকটা খুশী হয়। তিন নম্বর শত্রু হল কার নাম বলবে? অনেক অনেক নামের সঙ্গে মশাটাও জুটেছে যে।

মধ্যরাত্রের রাজপথ মানবশূন্য। কেন হাঁটছে, কোথায় হাঁটছে তা সে জানে না। এইসময় হরিধ্বনি শোনা গেল। রাস্তায় একপাশে দাঁড়িয়ে গেল গোপীনাথ। দশবারো জন মানুষ একটি মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে মন্থরভাবে ধ্বনি দিতে দিতে। তার পাশ দিয়ে ওরা চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে গোপীনাথ একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই রমণী বেশ কিছুটা দূরত্বে শবানুগমন করছে। এ নিশ্চয়ই ওই মৃতমানুষটির পত্নী। কিন্তু সাধারণত শ্মশানে স্ত্রীরা যায় না। রমণী ভালভাবে হাঁটতে পারছে না। তার দিকে কাতর চোখে তাকাল একবার। গোপীনাথের মায়া হল। তার স্ত্রী কখনই এত কষ্ট করে শ্মশানে যেত না। সে বলল, আপনি আস্তে আস্তে যান, ওরা বেশী দূরে যায়নি। রমণী চমকে উঠল, মাথায় ঘোমটা সামনের দিকে টেনে লজ্জিত ভঙ্গীতে দাঁড়াল। গোপীনাথ কি করবে বুঝতে পারছিল না। ওই অবস্থায় ঘোমটার আড়ালে রমনী বেশ আবেগকম্পিত গলায় 'তুমি এখানে ?'

গোপীনাথ চমকে উঠল। রমনীর মুখ যেটুকু সে দেখেছে তাতে কোনদিন পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। রমনী পথ ছেড়ে ফুটপাতে উঠে এল, "তুমি কি গো। এত নিষ্ঠুর তোমার মন। আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার একটুও কষ্ট হয় না।"

গোপানাথ বলে ফেলল, "আমি আপনার কোন কথা বুঝতে পারছি না। আপনি তো শবানুগমন করছিলেন। নিশ্চয়ই মৃতের আত্মীয় হন আপনি। অতএব আমাকে এসব কথা বলছেন কেন ?"

রমণী হাসল শব্দ করে। ঘোমটার আড়ালেও তা মনোহর মনে হন। রমণী বলল, নাগো আমি মৃতের আত্মীয় নই। মৃত্যু হওয়া মানে সব সম্পর্ক ছেদ হওয়া। আমি সবসময় জীবনের সঙ্গিনী। আহা, কপালে কোন শত্রু এমন কাণ্ড করলো।

"একটা মশা। বোলতার সাইজ।"

"বাড়িতে কেউ ছিল না ওষুধ লাগিয়ে দেবার ?'

"ছিল কিন্তু দেয়নি। শরীর উল্টে ঘুমোচ্ছে।"

আহা, তোমার কত কষ্ট। চল তুমি আমার সঙ্গে। আমি তোমার সব কষ্ট ভুলিয়ে দেব গো। যে গেল তারও দিয়েছিলাম কিন্তু পুরুষ মানুষ বড় অবাধ্য হয়। কথা শোনেনি তাই আজ এই গতি। এসো আমার সঙ্গে। গোপীনাথের মনে হল সমাজ সমস্যা ভেসে যাক। সে এই সুন্দরকণ্ঠির অধিকারিণীর সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবে। মধ্যরাত্রে

সে অনুসরণ করল রমণীকে। তারপর সব শূন্য। ঘুম ভাঙ্গতেই ধড়-মড়িয়ে উঠল গোপীনাথ। সে তার নিজের বিছানায়। তার মানে সে কখনও রাজপথে যায়নি? কপালে হাত বোলাল, জ্বালা ব্যথা এবং ফোলা রয়েছে। সে উঠতে গিয়ে শুনল স্ত্রী হাসছে, "আপনি কি সুন্দর কথা বলেন। ও সবসময় এমন গোমড়া থাকে যে আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করে না।" একটু চুপচাপ।

গোপীনাথ বলল, "তাই! আমি তাহলে ভাল?"

"খুব ভাল" স্ত্রী জবাব দিল, ঘুমের ঘোরে কথা বলছে। আর তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে গোপীনাথ পাশে বসে সজাগ হয়ে। এই স্ত্রীর গলা সে কখনও শোনেনি। এমন মোলায়েম এবং মধুর। স্ত্রী কথা বলছে তার মালিকের সঙ্গে। আর এখন গোপীনাথ মালিকের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ যেতে স্ত্রী আবার ঘুমিয়ে পড়ল মনের মত জবাব পেয়ে। অথচ একটু ঈর্ষা হচ্ছে না গোপীনাথের। সে স্থির করল আগামীকাল রাত্রেও সে স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমের ভেতরে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করবে। নিজের জীবনে যা পাওয়া যায়নি তা অন্যের ভূমিকায় অভিনয় করলে যদি পাওয়া যায় মন্দ কি। অবশ্য পরদিন সকালে মশার কৌটোকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কপালে শুধু এক ফোঁটা কালো দাগ জায়গা পাকা করে রাখল।

———

আদ্যশ্রাদ্ধ

প্রথম এসেছিল অমল।

দিল্লী থেকে প্লেনেই উড়ে আসবে ভেবেছিল, কিন্তু রত্না বলেছিল, 'খামোকা অত টাকা কেন নষ্ট করবে, ট্রেনেই যাও, কোম্পানির পয়সায় তো ট্যুরে যাচ্ছ না।'

কথাগুলো মনে ধরেছিল। অবশ্য টেলিগ্রাম পাওয়ার পর থেকেই মন অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। যেন দশমনি একটা পাথর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মনের আংটায়। নড়তে-চড়তে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস ভারী। সড়সড় করে সমস্ত ছেলেবেলা, কৈশোর এমন কি যৌবনের প্রারম্ভকাল শেকড়-উপড়ানোর মত চলে এল সামনে। তৎক্ষণাৎ অফিসে গিয়ে ছুটির দরখাস্ত করেছিল সে। মা মৃত্যুশয্যায়, ছুটি তো মঞ্জুর হবেই।

অফিসে বসেই প্লেনের জন্যে চেষ্টা করবে ভেবেছিল অমল। তার আগে বাড়িতে রত্নাকে খবরটা দিল। বৃন্দাবনদা টেলিগ্রাম করেছেন। সব শুনে রত্না ওই কথাগুলো বলেছিল। আর তারপরেই মনে হয়েছিল, খুব একটা দেরি হবে না। রাতের প্লেন ধরে কলকাতায় পৌছাতে সাড়ে দশটা। মাঝে মাঝে এত লেট হয় ছুটা বাজলেও অবাক হবার কিছু নেই। তার চেয়ে বিকেলের রাজধানী ধরে সকালেই পৌছে যাওয়া যায়। চটপট কিছু টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ও নতুন-দিল্লী স্টেশনের সামনে থেকে টিকিটের ব্যবস্থা করে বাড়িতে এসে শুয়েছিল খানিক। তিন বছরের বাপ্পা কাছে ঘেঁষতেই রত্না নিষেধ করেছিল, 'বাপ্পা, বাপীর কাছে যেও না, ঠাকুরমার শরীর ভাল নেই। সী ইস লিভিং আস।'

ইংরেজি চারটে শব্দ কানে খট্‌ করে বাজলেও চুপ করে থাকল অমল। তার সত্যিই কান্না পাচ্ছিল। কেউ রইল না তার। বাবার সঙ্গে কোনদিনই সম্পর্ক ভাল নয়। মা-ই তাকে সবসময় আড়াল

দিয়েছে। এমন কি রত্নাকে বিয়ের ব্যাপারটায় বাবার আপত্তি মায়ের জেদে নরম হয়েছিল। সেই মা চলে যাচ্ছে, হয়তো কলকাতায় গিয়ে দেখবে চলেই গিয়েছেন। বুকের আংটা ওজনের ভারে যেন খসে পড়ছিল।

প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে নেমে সে আর ট্যাক্সির লাইনের জন্যে দাঁড়ায়নি। বাড়তি টাকা দিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে ছুটে এসেছিল সল্টলেকে। এখানেই সুইমিং পুলের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শতদল দত্ত বাড়ি করেছেন। আধুনিক সেই বাড়িতে মোট পাঁচটি ঘর। দোতলায় দুটি, একতলায় তিনটি। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে অমল নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। কোন সাড়া শব্দ নেই। ভাড়া মিটিয়ে ব্যাগটা বাঁ হাতে নিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াতেই দোতলার বারান্দা থেকে বৃন্দাবনদার গলা পাওয়া গেল, 'ওই যে, ছোট দাদা এসে গিয়েছে।' বলার ধরনে এক ধরনের আহ্লাদ ছিল, সিঁড়িতে পা দিতে দিতে তেমনই মনে হল অমলের। কেউ মরে গেলে এমন গলায় কথা বলা যায় না। অন্তত বৃন্দাবনদার মত মানুষ তো পারবেই না।

বৃন্দাবনদা দরজা খুলেই বলল, 'যাক, তুমি এসে গিয়েছ। খুব ভাল হল।'

'মা কেমন আছে?' প্রশ্নটা যেন ছিটকে বের হল।

মাথা নাড়ল বৃন্দাবনদা, না, তারপরেই কেঁদে ফেলল, 'ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে।'

'কোথায় আছে? কোন নার্সিংহোমে?'

'না, না, বাড়িতেই আছে।'

'বাড়িতে? বাড়িতে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল বৃন্দাবনদা, 'বয়স হয়েছে। পনের দিন ধরে ভুগছেন, একটু একটু করে, শেষে বুকের ব্যথা বাড়ল। বাবু নার্স আনালেন, অক্সিজেন, স্যালাইন সব বাড়িতেই দেওয়া হচ্ছে, কোন ত্রুটি হয়নি।'

'দাদাদের খবর দিয়েছ ?'

'হ্যাঁ। একসঙ্গেই টেলিগ্রাম করেছি। চল।'

'বাবা কোথায় ?'

'তিনি তো মায়ের সামনে দিনরাত বসে আছেন। ওখানেই খান, ওখানেই ঘুমান। শুধু বাথরুমের সময় ওঠেন। আরও জড়ভরত হয়ে গেল মানুষটা।'

এইসময় বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়াল। বৃন্দাবনদা বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

অমল দেখল একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক বললেন, 'ভাল করেছেন এসে। ইটস এ লস্ট কেস। শরীর আর রেসপন্স করছে না। আমরা ভেবেছিলাম রাত কাটবে না। এখন যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণই লাভ।'

'আপনি ওঁকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করছেন না কেন ?'

'কোন লাভ নেই। এটা বয়সের ব্যাধি। নিজের জায়গায় শেষ নিঃশ্বাস ফেললে উনি বেশী আরাম পাবেন। তাছাড়া মিষ্টার দত্ত চিকিৎসার ত্রুটি রাখেননি।'

ডাক্তারের পেছন পেছন অমল ওপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকেই অমল শতদল দত্তকে দেখতে পেল। জানলার ধারে একটা ইজি চেয়ারে বসেছিলেন বৃদ্ধ। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই অমলের সঙ্গে চোখা চোখি হল। অজান্তেই কেঁপে উঠল অমল। বৃদ্ধের চোখে কোন অভিব্যক্তি নেই। এগিয়ে এসে প্রণাম করতে যেতেই শতদল বললেন, 'থাক। অসুস্থ মানুষকে প্রণাম করতে নেই।'

অমল হকচকিয়ে গেল। শতদলও কি অসুস্থ ? সে মুখ ফিরিয়ে দেখল ডাক্তার মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল মায়ের কাছে।

চারুশীলা শুয়ে আছেন। প্রায় অস্থিসার চেহারা। না, স্যালাইন বা অক্সিজেনের কোন চিহ্ন দেখল না অমল। ডাক্তার ওঁর নাড়ি

দেখছেন। স্টেথোস্কোপটা বুকে চাপলেন। তারপর মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'মিসেস দত্ত, আপনার ছেলে এসেছেন, মিসেস দত্ত?'

মায়ের মুখে কোন অভিব্যক্তি এল না। তাঁর চৈতন্য এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে জাগতিক কোন শব্দ পৌঁছায় না। ডাক্তার বৃন্দাবনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নার্স কোথায়?'

'এইমাত্র বাথরুমে গিয়েছে।' বৃন্দাবনদা জবাব দিল।

ডাক্তার চলে গেলেন শতদল দত্তের কাছে, 'আপনি কিন্তু সারাক্ষণ এখানে এভাবে বসে থেকে অন্যায় করছেন। আপনাকে তো ওঁর কথা বলেছি।'

'ও কখন যাবে ডাক্তার?'

'সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্ষেত্রে কোন কিছু করণীয় নেই।'

তাহলে আমার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিলেই ভাল হয়।' শতদল দত্ত মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর সেইসময় নার্স ঢুকল। মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল অমল। ভদ্রমহিলা সাদা শাড়ি, মানে যাকে বলে নার্সের ইউনিফর্ম পরেছেন বটে কিন্তু এমন লাস্যময়ী নার্স সে কখনও দ্যাখেনি। ডাক্তার ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওষুধ নিয়ে কথা বললেন। অমল মায়ের দিকে তাকাল। তার বুক কেঁপে উঠল। পাথরের মত মুখ। মাথায় হাত বোলালো সে। তারপর নিচু গলায় ডাকল, 'মা!'

চারুশীলার মুখে সামান্য কুঞ্চনও এল না। অমল কপাল, গাল, চিবুকে আঙুল বোলালো। তারপর গাঢ় গলায় আবার ডাকল, 'মা! মা গো!'

চারুশীলার কোন পরিবর্তন হল না। নার্স এগিয়ে এলেন, 'এক্সকিউস মি, উনি রেসপন্স করতে পারবেন না। ডেকে কোন লাভ নেই।'

মেজাজ খুব বিগড়ে ছিল কমলের। সুজাতা টিভি সিরিয়ালের সুটিং করতে গিয়ে ভোর রাতে বাড়ি ফিরেছে। সে পইপই করে

বলেছিল টিভিতে অভিনয় করছ কর কিন্তু বাড়ির শান্তি যেন বজায় থাকে। সুজাতা সুন্দরী। যদিও তেত্রিশ বছর বয়েস কিন্তু রাখতে পেরেছে বলে পঁচিশের বেশী মনে হয় না। ফিল্মেও সুযোগ পেয়েছিল সুজাতা। কিন্তু রাজি হয়নি কমল। টিভি যেন ঘরোয়া শিল্প, সুজাতারও খুব আগ্রহ ছিল, রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। সুটিং-এর জন্যে বাইরে রাত কাটানো এর আগে কখনও হয়নি। ইতিমধ্যে সুজাতার একটা সিরিয়াল নেটওয়ার্কে দেখিয়েছে। অফিসে এই কারণে কমলেরও গ্ল্যামার বেড়েছে। সুজাতার সঙ্গে বাইরে বেরুলে কেউ না কেউ তাকাবেই। গর্ব যে হয় না তা নয়। তাই বলে রাত কাটিয়ে ফিরবে? মেজাজ তাই ভাল ছিল না। এমন সময় টেলিগ্রামটা এল। মা মৃত্যুশয্যায়, তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃন্দাবনদা।

থপ্ করে বুকের বাঁ দিকটায় যেন খিচ লাগল কমলের। মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি অন্তত পাঁচ বছর। পাঁচ বছর কলকাতায় যাওয়া হয় না। বাবা সল্টলেকে বাড়ি করেছেন তা পাঁচ বছর আগে দেখে এসেছে সে। জন অ্যাণ্ড মিল কোম্পানির পাবলিক রিলেশন অফিসার কমল দত্ত এখন এত ব্যস্ত মানুষ যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আত্মীয়দের সঙ্গে রাখতে পারে না। কিন্তু মা অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায়, জানতে পারা মাত্র ওর মনে হল এক্ষুণি কলকাতায় যাওয়া উচিত। ভোর রাতে ফেরা সুজাতাকে ঘুম থেকে তুলে ঘটনাটা বলল সে। সুজাতা বলল, 'অসম্ভব। আমার আগামী চারদিন সুটিং আছে। যাওয়ার ইচ্ছে হলে তুমি যাও।'

প্রচণ্ড রেগে গেল কমল, 'কি আশ্চর্য, আমার মা তোমার শাশুড়ি!'

চোখ ছোট করে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজ হঠাৎ খেপে গেলে কেন?'

'মানে?'

'এতগুলো বছর একবারও বুঝতে পারিনি মায়ের ওপর তোমার এমন টান আছে। উনি চিঠি দিলেও তো উত্তর লেখার সময় পেতে

না। তাছাড়া ভদ্রমহিলা অসুস্থ, আমার কিছু বলার নেই. কিন্তু তুমি তো জানতে ওঁর বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে।'

কমল জানে। জানে বলেই সেইসময় মায়ের ওপর বেশ রেগে গিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে দুদিন থাকতে না থাকতেই সুজাতা হয় দার্জিলিং নয় দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান করত। মা বলেছিলেন, 'তাহলে লোক দেখিয়ে এখানে ওঠা কেন বাপু, হোটেলে থেকে ওসব করলেই পার।' কথাগুলো না বললেই পারতেন মহিলা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখে এসেছে কমল, উনি সোজা কথা মুখের ওপর বলে দেন। বাবার সঙ্গে যে কতবার ঝগড়া এবং কথা বন্ধ হল তার ইয়ত্তা নেই।

অতএব আর কথা বাড়াল না কমল। যতই হোক মা ইজ মা, সে মনে মনে বলল। অতএব বোম্বে থেকে সকালেই প্লেনে দমদমে পৌঁছে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অবস্থা প্রায় ট্রেনের মতন। এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি ধরতে বেলা বারোটা বাজল। সেখান থেকে সোজা সল্টলেক।

বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সিগারেট ধরালো কমল। মা যদি চলে গিয়ে থাকে, হঠাৎ বুকের ভেতর মেঘ জমতে শুরু করল, ঠোঁট কামড়াল সে। পা ভারী হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে বেল বাজাল। মিনিট খানেকের অপেক্ষা। কমলের মনে হচ্ছিল সে অন্য কারো বাড়িতে এসেছে। বয়স এবং দূরত্ব কিভাবে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়! দরজা খুলল। কমল অবাক হল, অমল দাঁড়িয়ে, পরনে পাঞ্জাবি এবং পাজামা। অর্থাৎ অমল তার আগেই এসে গিয়েছে। অমল বলল, 'ওঃ দাদা, এসো।'

কমল ঘরে ঢুকল। অমলকে সে কত বছর পরে দেখছে তা মুহূর্তে মনে করতে পারল না। ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে আরও অস্বস্তি বাড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা!'

'অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তার এসেছিলেন একটু আগে। বললেন কোন চান্স নেই।'

'ঠিক কি হয়েছে?'

'বললেন বয়স হলে যা হয়। কথাও বলতে পারছেন না, কোন হুঁশ নেই।'

কমল ঠোঁট কামড়াল। হঠাৎ তার কান্না পেল। মুখ চোখ তুমড়ে গেল। চোখ ঝাপসা। ব্যাপারটা অমলকেও আচমকা স্পর্শ করল, 'দাদা, শক্ত হও। শী ইজ স্টিল উইথ আস।'

'মেজ আসেনি ?'

'না। আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে টেলিগ্রাম করেছিল বৃন্দাবনদা।'

'আমরা বোম্বে দিল্লী থেকে আসতে পারলাম আর ও গৌহাটি থেকে—। যাক, বাবা কেমন আছে ? শক্ত আছে তো ?'

'মনে হয় না। মায়ের ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।'

'সেকি ? মা কি বাড়িতে আছে ?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ হবে না। মায়ের কাছে গিয়ে আমারও তাই মনে হল।'

কমল সোফায় বসে পড়ল। দুহাতে মুখ ঢাকার চেষ্টা করে আঙুলের ডগায় চোখ মুছল। অমল উল্টো দিকে বসল। মুখ গম্ভীর। সে দাদাকে একবার দেখল। বউদি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করছে অথচ দাদার চেহারায় বয়স এসে গিয়েছে বেশ। জুলপি পাকা, সামনের দিকের চুল অনেকটা উঠে গিয়েছে। ভারী হয়েছে শরীর। ছেলেবেলায় দাদাকে সবাই বলত গুডি বয়। লালুভুলু। দাদার চেহারায় সেই মোলায়েম ব্যাপারটা আর নেই। ভাল চাকরি করে, পয়সাও বানিয়েছে কিন্তু অমলের মনে হল সুখে নেই দাদা। রত্না তো বউদিকে সহ্য করতে পারে না। নেটওয়ার্কের সিরিয়ালে অভিনয় দেখে প্রচুর খুঁত বের করেছিল। কিন্তু আজ অমলের মনে হল দাদার মধ্যে আগেকার ভাল মানুষ ব্যাপারটা এখনও রয়ে গেছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওপরে যাবে না দাদা ?'

কমল মুখ তুলল, 'আমি মাকে ওভাবে দেখতে চাইনি অমল !'

এইসময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। অমল নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। তারপরেই গলা তুলে বলল, 'মেজদা এসেছে।'

কমল শরীরটাকে তোলার চেষ্টা করেও আবার বসে পড়ল। সে শুনল, শ্যামল বলছে, 'মা কেমন আছে?'

অমল তাকে দরজাতে দাঁড়িয়েই একই ঘটনা বলে গেলে সে ভেতরে ঢুকল। শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'ও দাদা, কখন এলে?'

কমল কাঁধ নাচাল। শ্যামল সোফায় বসে বলল, 'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'আমি ওপরে যাইনি এখনও। যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না।' কমল জবাব দিল।

শ্যামল বলল, 'আমি তো টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক। গতবছর একবেলার জন্যে কলকাতায় এসেছিলাম, মানে রাত্রে এসে পরদিনই চলে গিয়েছিলাম, তবু সময় বের করে এখানে এসে দেখা করে গিয়েছি। মা তখন অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। আমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হল। তেমন কিছু নয়। কোন অসুখ তো দেখিনি।'

কমল জানতে চাইল, 'কি নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছিল?'

'সিলি ব্যাপার! আসলে কলকাতায় এলে বড়শালার কাছে না উঠলে এমন ঝামেলা হয় যে কি বলব। মা তাই নিয়ে—ছেড়ে দাও। আমাকে যে বউ-এর সঙ্গে সারাজীবন বাস করতে হবে তা মায়ের মাথায় ঢোকে না। অথচ বাবা তো চিরকাল বউ-এর বাদি মেনে চললেন সেটা তো আমরা দেখেছি। সত্যি মারা যাবে?'

কমল, 'অমল তো বলল ডাক্তার তাই বলেছে?'

'উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না।' চোখ বন্ধ করল শ্যামল।

অমল বলল, 'তোমরা ওপর থেকে ঘুরে এসো। কখন যে ঘটনাটা ঘটে যাবে কে জানে।'

এইসময় বৃন্দাবনদা নেমে এল একটা ট্রে হাতে নিয়ে। এদিকে তাকাতেই লোকটার মুখে হাসি ফুটল, 'আমি জানতাম খবর পাওয়া মাত্র তিনজনেই চলে আসবে। হাজার হোক পেটের ছেলে।'

কমল তাকে ইশারায় ডাকল, 'মা কি করছেন?'

'যাও না, দেখে এসো। এতদূর ছুটে এসে এখানে বসে আছ কেন?'

কমলের বারো বছর বয়সে বৃন্দাবন এ বাড়িতে কাজে লেগেছিল। এখন ওই কথা বলার ধরনে তার রাগ হলেও সে চুপ করে গেল। বৃন্দাবন বলল, 'দেখা করে এসে হাতমুখ ধুয়ে নাও সবাই, আমি চা বানাচ্ছি। জলখাবার খাবে না একেবারে ভাত দেব?'

শ্যামল বলল, 'হোল নাইট ট্রেনে জেগে এসেছি, আমি শুধু চা খাব।'

বাকি দুজন কিছু বলল না। শ্যামল বলল, 'অমল, তুইও চল সঙ্গে।'

শতদল দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে চারুশীলার মাথায় হাত রাখলেন। বেশ উত্তাপ আছে। কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিলেন। বাঁ হাত বুকের ওপর ভাঁজ করা আছে, সরিয়ে রাখলেন। প্রথম প্রথম নার্সের সামনে এসব করতে সঙ্কোচ হত, আজকাল হয় না। কিছু করার না থাকলে মেয়েটা পাশের চেয়ারে বসে সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে। চেয়েও ছ্যাখে না তিনি কি করছেন। শতদল ঝুঁকে পড়লেন, 'চারু, চারু! শুনতে পাচ্ছ? ও চারু। ইউ কান্ট্ গো লাইক দিস। আমি তোমার থেকে পাঁচ বছরের বড়, যাওয়ার কথা আগে আমারই। চারু।'

এইসময় দরজার কাছে শব্দ হল। চমকে সোজা হতে হতে পেছন ফিরলেন শতদল। তিন পুত্র একই সঙ্গে দরজায়। হঠাৎ তিনি তিনজনের ভাল নাম মনে করতে পারলেন না। তবে বোম্বে গৌহাটি দিল্লীর কথা মনে পড়ল। তার তিন প্রবাসী পুত্র।

তিনি কোন কথা না বলে চুপচাপ জানলার পাশের ইজিচেয়ারে ফিরে গেলেন। ওরা ধীরে ধীরে চারুশীলার পাশে এসে দাঁড়াল। কমল ডাকল, 'মা, মা!'

নার্স বলল, 'উনি শুনতে পাচ্ছেন না।'

কমল। থমকে যেতেই হঠাৎ একটা শব্দ, যা কান্নারই বহিঃপ্রকাশ, ছিটকে এল গলা থেকে। শতদল কথা বললেন, 'এখনও সময় হয়নি। অসময়ে কান্নাকাটি এই ঘরে হোক আমি চাই না।'

তিন পুত্র একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল শতদল কথাগুলো বলেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছেন। শ্যামল এগিয়ে গেল তাঁর কাছে, "বাবা।'

'বলতে পার।'

'বাবা, আপনি এখন আর আমাদের ওপর রাগ করবেন না।'

'আমি রাগ করেছি এই খবর কোত্থেকে পেলে?'

'না মানে, আচ্ছা, মায়ের চিকিৎসা আর একটু ভালভাবে করা যায় না?'

'খারাপভাবে হচ্ছে তা তোমাকে কে বলল?'

'আমি ভাবছিলাম যদি ওঁকে নার্সিংহোমে, মানে আমার শালা তো নামকরা ডাক্তার ওর নার্সিংহোম আছে, আপনি তো জানেন—, আর একটু চেষ্টা করা যেত।'

'তোমার আর কোন কথা বলার আছে?' শতদল সরাসরি তাকালেন।

এবার কমল এগিয়ে গেল, 'বাবা, আপনার কি মনে হচ্ছে মায়ের চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছে না? আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমরা কয়েক মিনিট আগে এসে কি করে বুঝে গেলে ট্রিটমেন্ট ঠিক হচ্ছে না। অবশ্য তোমরা ওর ছেলে, তোমরা বলতেই পারো।'

'আপনি যখন বলছেন তখন আমাদের আর কি বলার থাকতে পারে। কিন্তু আপনার এবার বিশ্রামের প্রয়োজন। এভাবে বসে থাকাটা ঠিক নয়।'

শতদল কমলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তোমরা সবাই একাই এসেছ?'

কমল ঠোঁট কামড়াতে গিয়েও সামলে নিল, 'হ্যাঁ।'

'বেশ। তাহলে নিচে যাও, খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নাও। অনেকদিন বাদে তিন ভাই পরস্পরের দেখা পেলে। অন্তত খবর পাওয়া মাত্র এসেছ বলে আমি খুশী।'

বৃন্দাবনদার রান্না খারাপ নয়। যদিও আর একটি কাজের মেয়ে রয়েছে। ওরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরের ঘরে এসে বসল। আগে অমল দাদাদের সামনে সিগারেট খেত না, আজ ধরাল। কমল জিজ্ঞাসা করল, 'তোর খবর কি?'

'চলছে। বউদির সিরিয়াল দেখলাম।'

'ওই, হবি আর কি! আমি বাধা দিই না। রত্না কেমন?'

'আছে। আসতে চেয়েছিল, আমি সঙ্গে আনিনি।'

'ভালই করেছিস। এখানে এত টেনশন—।'

শ্যামল চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'বাবাও কেমন বদলে গিয়েছে।'

কমল হাসল, 'বাবার সঙ্গে চিরকালই আমাদের দূরত্ব ছিল।'

অমল বলল, 'বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালবাসেন।'

কমল বলল, 'আগে বুঝিনি। আজ মনে হল। মানুষের বোধহয় বয়স বাড়লে প্রেমও বাড়ে। তোর মনে আছে শ্যামল, একবার স্কুল থেকে কার রবার চুরি করেছিলি বলে বাবার কাছে জোর মার খেয়েছিল।

'এই যাঃ। আমি চুরি করিনি। ভুল করে নিয়ে এসেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে কমল এবং অমল হেসে উঠল। হঠাৎই ওরা অতীতে ফিরে গেল। তিনজনেই স্মৃতিতে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা তুলে এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা শুরু করল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সবাই ঘটনাটার বিশ্লেষণে একমত হচ্ছিল না। তবু এই জাবর কাটায় খুব মজা পাচ্ছিল। অনেক অনেক কাল এই ধরনের কথাবার্তা বলা হয় না। এইসব কথা বলার মানুষও চারপাশে থাকে না। কবে কখন

কমল অমলকে চাঁটি মেরেছিল চটি পরার জন্যে, কবে শ্যামল কমলের একটা টাকা চুরি করেছিল, তখনকার রাগ আজ নেহাতই সুখকর স্মৃতি। তিন ভাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। এইসময় বৃন্দাবনদা এল, 'অনেক কষ্টে বাবুকে শুতে পাঠিয়েছি। তোমরা একজন ওপরে যাবে ?'

অমল তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বাকি দুজনের মনে ওই মুহূর্তে ইচ্ছে এলেও অমলকে উঠতে দেখে তারা আর উদ্যোগ নিল না। অমল চলে গেলে শ্যামল বলল, 'অমলটা সেই ছেলেবেলার মত রয়েছে। সব কিছু আগে না পেলে কি রকম কান্নাকাটি না করত!'

কমল বলল, 'বুঝলি, অনেক ভেবে দেখলাম জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল ছেলেবেলা। কি ভালই না ছিলাম তখন। টেনশন ছিল না, নিজের কথা ভাবতে হত না।'

'সত্যি কথা। এখন টাকা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা— ।'

'আমাকে তো ভগবান ও ব্যাপারে দয়া করলেন না।'

'ডাক্তাররা কি বলছে ?' শ্যামল জানতে চাইল।

মেজভাই-এর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তবু কমল বলল, 'হবে না।'

শ্যামল নিঃশ্বাস ফেলল, 'খুব টায়ার্ড লাগছে। রাত্রে ট্রেনে ঘুমাতে পারিনি।'

'ঘুমিয়ে নে!'

'নাঃ। একবার শ্যালকের বাড়ি যেতে হবে। কখন মায়ের কি হয়ে যায়, তখন আর সময় পাবনা। আমি বরং ঘুরেই আসি। শ্যামল উঠল।

অমল মায়ের পাশে বসে দেখল মাঝে মাঝে গালের চামড়ায় কুঞ্চন হচ্ছে। সে ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'মা!'

'উনি শুনতে পাবেন না।' নার্সটি বলে উঠল।

'আপনি এরকম কেস আগে দেখেছেন ?' অমল মুখ তুলে মহিলাকে দেখল। চেহারা দেখে নার্স বলে মনে হয় না। বউদির বদলে ইনি টিভি সিরিয়ালে নামলে বেশী নাম করতে পারতেন।

মহিলা ঠোঁট টিপে হেসে নিয়ে বললেন, 'অ-নে-ক। আপনারা মন তৈরী করে নিয়েছেন। শুধু আপনার বাবা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।'

অমল মায়ের পাশ থেকে উঠে বাবার খালি চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

নার্সটি সিনেমার পত্রিকায় নজর রাখল। অমল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সবসময় এইভাবে বসে থাকেন? ডিউটি কতক্ষণ?'

'চব্বিশ ঘণ্টার। ইচ্ছে করেই নিয়েছি। টাকার খুব দরকার।' আবার হাসি।

'কত টাকা দেওয়া হচ্ছে?'

'দেড়শ।' পত্রিকাটি পাশে রাখল সে, 'আপনি দিল্লীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'দিল্লীতে আমার স্বামী থাকেন।'

'ও। আপনারা আলাদা আছেন?'

'অনেক দিন। বছরে একবার দেখা হয়। বাপের বাড়ির খরচ চালাই বলে টাকার দরকার। আমার অবশ্য এই চাকরি করার কথা নয়।'

'আপনাকে দেখে তাই মনে হয়।'

দুচোখে অদ্ভুত কাজ দেখাল মহিলা, 'কি মনে হয়?'

'আপনি অন্যরকম।'

মহিলা মুখ নামালেন। অনেকক্ষণ কোন কথা হল না। হঠাৎ মহিলা বললেন, 'আমি তো আছি। আপনি বিশ্রাম নিন। অতদূর থেকে এসেছেন?'

'আমি এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে?'

'না, না।' প্রতিবাদ করলেন মহিলা। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে। আর হঠাৎই সেইসময় শিহরন বোধ করল অমল। ভদ্রমলিার চোখে অদ্ভুত আকর্ষণী ক্ষমতা রয়েছে। এই সময় বৃন্দাবনদা এল, 'যাও, গিয়ে একটু শোও আমি বসছি।' বসে থাকতে খুব আরাম পাচ্ছিল অমল কিন্তু না উঠে পারল না। ওঠার সময় আর এক দফা চোখাচোখি। অনেক কথা যেন বলা হয়ে গেল।

বিকেলে ডাক্তার এলেন। চারুশীলাকে দেখে নেমে এসে বললেন, 'অবস্থা আরও খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে কয়েক ঘন্টা। কিছু হলে আমাকে খবর দেবেন।'

ডাক্তার চলে গেলে কমল বলল, 'অন্যান্য আত্মীয়দের খবর দেওয়া উচিত।'

শ্যামল প্রতিবাদ করল, 'আত্মীয়? এরা এখানে রয়েছেন কেউ তো দেখতে আসেনি। ছেড়ে দাও ওসব। কিন্তু সন্ধ্যের পর কিছু হলে কি করবে?'

অমল কেঁদে ফেলল। শ্যামল ধমকালো, 'বোকার মত কাঁদিস না। ওইভাবে পড়ে থাকার চেয়ে মায়ের যাওয়াই ভাল।'

কমল নিশ্বাস ফেলল, 'খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন?'

অমল ভাঙা গলায় বলল, 'বাবার কি হবে?'

শ্যামল বলল, 'সেটাই ভাবছিলাম। বাবা তো আমাদের কারো কাছে গিয়ে থাকতে পারবেন না। অবশ্য বৃন্দাবনদা আছে এখানে।'

কমল, 'মিছিমিছি খরচ করলেন বাড়িটার পেছনে?'

শ্যামল বলল, 'কথা শুনবেন না। আমি তো বলেছি এ বাড়ির ওপর আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। আমি তো এসে থাকব না কোন দিন।'

অমল বলল, 'ইন্টারেস্ট আমারও নেই।'

'বাবা না থাকলে বিক্রী করে দিতে হবে।' কমল বলল।

শ্যামল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিভাবে নিয়ে যাবে?'

তিন ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। অমল বলল, 'এসব কথা এখনই বলা কি ঠিক? অবশ্য ডাক্তার বলে গেলেন—!'

কমল বলল, 'তখন মাথা ঠিক থাকবে না। কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া খুব প্রিমিটিভ আইডিয়া।'

শ্যামল বলল, 'গাড়ি পাওয়া যায়। শালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও একটা ফোন নম্বর দিয়েছে। ফোন করলেই চলে আসবে গাড়ি।'

অমল বলল, 'গুড। কাঁচের গাড়ি নিশ্চয়ই।'

'তাই তো।'

'আর ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে কাজ করব। চিতা ফিতা সহ্য করতে পারব না। তবে কাছাকাছি ইলেকট্রিক চুল্লি আছে কিনা জানি না।'

শ্যামল বলল, 'কাগজে পড়েছি নিমতলাতে আছে। ওটাই কাছে।'

'ফুলটুল— ?' কমল জিজ্ঞাসা করল।

'ওই গাড়ির জন্যে ফোন করেই বৃন্দাবনদাকে পাঠাবো।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা ভারী আবহাওয়া তৈরী হয়ে গেল। হঠাৎ অমল বলল, 'উঃ। ছেলেবেলায় মা আমাকে ভাত খাইয়ে দিত।'

কমল বলল, 'সবাইকে মা দিয়েছে। যাই বলিস, মায়ের বিকল্প অন্য কোন মেয়ে হয় না। সুজাতার মধ্যে টেন পার্সেন্ট গুণও নেই।'

'রত্নার মধ্যে আছে ভেবেছ ? ওই ম্যাক্সিমাম টেন পার্সেন্ট।'

অমল ফোঁস করে উঠল। শ্যামল কোন মন্তব্য করল না।

কমল বলল, 'কাল সকালের বোম্বে ফ্লাইট কখন রে ?'

'কালই চলে যাবে ?' অমল জানতে চাইল।

'আর থেকে কি করব। খাঁ খাঁ করবে বাড়ি।'

'তা ঠিক। আমিও ভাবছি দিল্লীর ফ্লাইট ধরব। এক্সট্রা কিছু খরচ হবে, রত্না চটবে, বাট নাথিং ডুয়িং।' অমল বলল।

'তোদের টাকা আছে, প্লেনে যা। আমি ভাই ট্রেনে। সকালে শালার বাড়িতে চলে যাব। সন্ধ্যেবেলায় কামরূপ এক্সপ্রেস।' শ্যামল বলল।

অমল বলল, 'ভালই হল। কাল অফিসে যাওয়া জরুরী ছিল।'

কমল হাত নাড়ল, 'তুই জানিস না, এইভাবে হুট করে চলে এসে কি ক্ষতি করলাম নিজের! ভার্মা এই চান্সকে কাজে লাগাবেই। পেছনে পড়ে আছে আমার! কাল ব্যাটাকে চমকে দেব।'

ছোট বলেই অমলের ওপর দায়িত্ব পড়ল মাঝে মাঝে মায়ের ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা। এখন শতদল দত্ত চারুশীলার মাথার পাশে

বসে আছেন। বারংবার ঢুকতে লজ্জা হল। অমল ইশারায় নার্সকে বাইরে ডাকল, 'যদি মাঝে মাঝে বাইরে এসে আমাকে বলে যান মা কেমন আছে, বুঝতেই পারছেন বাবা মাকে এখন একা পেতে চাইছেন— ।'

হাসল মেয়েটি, 'ওঁদের মধ্যে খুব গভীর প্রেম ছিল, না?'

বাবা-মায়ের প্রেম নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হল না অমলের, সে হাসল।

নার্স বলল, 'ঠিক আছে। আমি নিচে যাব, না আপনি ওপরে আসবেন?'

'আমিই আসব। এত পরিশ্রম করেও আপনি হাসেন কি করে বলুন তো?'

'আমার হাসি আপনার খারাপ লাগে?' চোখে কাজ এল।

'না, না। দারুণ!'

'আহা।' শরীর ঘুরিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

মিনিট পনের বাদে বৃন্দাবন ছুটে এল ওপর থেকে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগল। তিন ভাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডাক্তারকে ফোন করে বৃন্দাবন বলল, 'মা কেমন করছে!'

ডাক্তার এলেন। রাত দশটা পর্যন্ত তিন ভাই প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করল। মাঝে মাঝে সবাই ওপরে যাচ্ছে। আর তখন চারু-শীলার গলা থেকে বের হওয়া যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পেল ওরা। চারুশীলা বলছেন, 'উঃ, আঃ।'

এগারটার সময় ডাক্তার নিচে নেমে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। আমার জীবনে এমন কেস কখনও দেখিনি।'

'কি অবস্থা?' শ্যামল জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তার বললেন, 'নার্সিংহোমে ফোন করতে হবে।'

'নার্সিং হোম? কি ব্যাপার?' কমল চমকে উঠল।

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ জীবনের লক্ষণ ফিরে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করা দরকার। এখনই।'

ডাক্তার ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনতে বললেন। অমল জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আজ রাত্রে কোন সম্ভাবনা নেই?'

'কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় নেবার আগে প্রদীপ বেশী আলো দেয়। তবে মনে হচ্ছে এবার ফাইট করার সুযোগ পাওয়া যাবে। আসলে আপনার বাবার মনের জোরেই উনি বোধহয়—।'

অ্যাম্বুলেন্স এল। ষ্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হল চারুশীলাকে। তিন ভাই এবং শতদল দত্ত সঙ্গে গেলেন। শতদল দত্তকে নিষেধ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি শোনেননি। ভর্তি হবার পর শতদল অসুস্থ বোধ করলেন। নার্সকে বাড়িতেই রেখে আসা হয়েছিল। অত রাত্রে বেচারা কোথায় যাবে। নার্সিংহোমে চারুশীলার পাশে থাকতে দেওয়া হবে না শতদলকে। তাঁর শরীর খারাপ লাগছিল। অতএব অমল তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনল। আসার পর শতদল বললেন, 'জীবনে কখনও প্রার্থনা করিনি হে। তোমার মা অসুস্থ হবার পর থেকে করে যাচ্ছিলাম। আমি এখন নিশ্চিত যে সে ফিরে আসবে।' অমল বলল, 'এ নিয়ে ভাববেন না।'

নার্সকে ঘুম থেকে তোলা হল। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে সে শতদলকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। অমল ফিরে এল নিজের ঘরে। দাদারা নার্সিংহোমে। বৃন্দাবন তার বাবুর ঘরে বিছানা করে মাটিতে শুয়েছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। অমল দেখল নার্স দুটো সন্দেশ আর জল নিয়ে তার ঘরে ঢুকছে, 'এগুলো খেয়ে নিন। আজ তো কিছুই পেটে পড়েনি।'

'অনেক ধন্যবাদ।' হাসল অমল।

'আমার চাকরি গেল।'

'না। বাবাকে দেখাশুনা করবেন আপনি।'

'সত্যি? আপনি কি ভাল।'

অমলের অনেক কিছু ইচ্ছে হচ্ছিল। বিয়ের পর সে রত্না ছাড়া

কোন মেয়েকে কামনা করেনি। আজ সেই ইচ্ছেটা হল। নার্স বলল, 'আপনার মা ভাল হয়ে যাবেন। আমার মন বলছে ভাল হবেনই।'

'তবু আপনি ওদের দেখাশুনা করবেন।'

'কিন্তু আপনি তো এখানে থাকবেন না।'

'হুঁ। মাঝে মাঝে আসব।'

'অদ্ভুত!' ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিথ্যে কথা কেন বলেন? আপনাদের স্ত্রীরা এখানে আসতেই দেবে না মাঝে মাঝে।'

'একথা আপনাকে কে বলল?'

'আপনার মা। যখন প্রথম এলাম তখন বলেছিলেন।' নার্স ফিরে গেল। অমলের মনে হল সে যেন প্রচণ্ড এক চড় খেয়েছে।

ভোরবেলায় দুই ভাই ফিরে এল। চারুশীলার মধ্যে জীবনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এখন শুধু লড়াই করার সময়। এই লড়াই কদিন ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। ডাক্তার বৃন্দাবনদা এবং নার্স আছে। অতএব ছুটি নিয়ে অনন্তকাল কেউ বসে থাকতে পারবে না।

তিনভাই একসঙ্গে শতদলের ঘরে গেল। তিনি তখন বিছানায় বসে। চুপচাপ চারুশীলার খবর শুনলেন। শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, লড়াই করার সুযোগ পেলে সে কখনও হারবে না। আমার জন্যেই তাকে ফিরে আসতে হবে। দায় তার, দায় আমার। তা তোমরা এখানে থেকে কি করবে?'

'আমরাও তাই ভাবছিলাম।' কমল বলল।

'ঠিকই ভেবেছ।'

'যদি মায়ের শরীর, মানে কিছু হয়, সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন।'

'কেন?'

'আমরা চটপট চলে আসব।'

'না, না' মাথা নাড়লেন শতদল। হিন্দুদের শাস্ত্র আমি ভাল জানি না। তবে মাতৃদায় তো একেবারেই মিটে যায়। তোমাদের মিটে গিয়েছে, এই এসে চুকিয়ে দিলে, দ্বিতীয়বারের কি প্রয়োজন?'

মনীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে দেবার পর আবিষ্কার করলেন বেঁচে থাকার আর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর দুটি মেয়ে, বড়র বিয়ে হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। সেটি খুব শান্ত শিষ্ট, পড়াশুনায় ভাল, গলার স্বর নিচু, বাড়িতে থাকলে বোঝাই যেত না। অবিকল মনীন্দ্র গলায় জননীর স্বভাব পেয়েছিল সে। তার বিয়ের পর ছোট মেয়েকে নিয়ে ভুলে ছিলেন মনীন্দ্রনাথ। ছোট ডানপিটে, বশ মানাতে হিমসিম খেয়েছেন মণীন্দ্রনাথের স্ত্রী আরতি। বাপের প্রশ্রয়ে তিন পা মেলে ধরাকে সরা দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ করতেন। সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল যেই অমনি বাড়িটা শ্মশান। যাকে শাসন করতে দিন যেত তার অনুপস্থিতি যেন মরুভূমির মত করে দিল জীবনটাকে। এখন বেঁচে থাকা মানে রোজ সকালে বাজার করা, কাগজ পড়া, চা-ভাত খাওয়া, বিকেলে পার্কে বেড়াতে যাওয়া আর সন্ধ্যের পর টি ভি দেখা।

আরতি কোন কালেই সুন্দরী ছিলেন না। মেয়েদের পনের বছর পার হবার আগেই যৌবন সম্পর্কে সব আগ্রহ হারিয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে প্রেম করেননি অনেককাল। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। মন টানে ঠাকুরঘর, টি ভি আর রান্নাঘর। স্বামী বস্তুটিকে চোখে চোখে রেখে ভাল খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখলে বেশ কিছুদিন আরামে থাকা যাবে, মুখে না বললেও, এমন ধারণা তাঁর মনে আছে বলে মনীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

ভারী শরীর, বাত এবং অম্বল সবসময়ের সঙ্গী, প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করেন না যে স্ত্রী, তাঁর প্রতি প্রেমের চোখে তিনি কিভাবে তাকাবেন! ওঁকে দেখলেই তাঁর ক্ষ্যান্তমাসীর কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় তাঁদের পাড়ার ওই চেহারার এক মহিলা ছিলেন। পূর্ণিমা-অমাবস্যা আর একাদশীতে তিনি এমন চিৎকার করতেন যে পাড়ার লোকে

বলত, ওরে ক্ষ্যান্ত ক্ষ্যামা দে। বাত বলে বাত, রাম বাত। মাঝে মাঝে আরতির সঙ্গে ক্ষ্যান্তমাসীকে গুলিয়ে ফেলেন তিনি। অথচ এ জীবনে অন্য কোন নারীর আঙ্গুল ছোঁয়া হয়নি, প্রেম করা তো দূরের কথা। এই এক এবং অদ্বিতীয়াকে নিয়েই রইলেন।

এখন এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেবলই মনে হচ্ছে তিনি কি পেলেন? অল্প বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। বাবা বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে এলেন। দুটি মেয়ে হল। মা গিয়েছিলেন আগেই, বাবাও চলে গেলেন। একসময় তাঁকে ডাক নাম ধরে ডাকার কেউ রইল না। এবার দুই মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে তাঁকে চিরকালের জন্য ছেড়ে গেল। নিজের জন্যে কোন আমোদ প্রমোদ ফুর্তি করার অবকাশই পাননি কোনদিন। দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর হাজার পঞ্চাশেক ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। বাড়ি ভাড়া বাবদ পান দু'হাজার। সুদ আর এই টাকায় দুজনের বেশ চলে যাওয়া উচিত।

কিন্তু এই চলার কি কোন মানে আছে? সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের মেয়ের হাতের তৈরি চা খেয়ে বাজারে যাওয়া। সেখান থেকে ফিরে কাগজ নিয়ে বসা। তখনও শ্রীমতী ঠাকুরঘরে। কোন কোনদিন রেশন, কোনদিন কেরোসিনের লাইন, ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিল দিতে দুপুরের আগে ছুটোছুটি করো। তারপর স্নান খাওয়া সেরে যখন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে যাও তখন গিন্নির ফিরিস্তি কল বাজবে। অমুক মেয়ের বাড়িতে এই পাঠাতে হবে, ওকে তাই। বাতের ব্যথাটা বড্ড চনমন করছে। বড় জামাই বড়বাজার থেকে এক কৌটা জর্দা এনে দিয়েছিল মাস ছয়েক আগে মুখে লেগে আছে। বারবার তো বলা যায় না জামাইকে, তা ঘরের মানুষ কোন কাজে যদি লাগে। এসব উপেক্ষা করে যদি তিনি শ্রীমতীকে বলেন, 'এসোনা, একটু পাশে শোবে', সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় হবে তাঁর, 'তিনকাল গিয়েও চৈতন্য হল না। বাড়িতে কাজের মেয়ে ঘুরঘুর করছে তবু লজ্জা হয় না।'

অতএব বিকেলে পার্ক, সন্ধ্যায় টিভি আর রাত্রে অনিদ্রা। তখন

মরীয়া হয়ে বন্ধ দরজা দেখিয়ে মনীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে কাছে ডাকলেন। শ্রীমতী যেন ভূত দেখলেন, 'তোমার ভীমরতি হয়েছে, আমি মরছি শরীরের জ্বালায় আর উনি চাইছেন সোহাগ। আমাকে জ্বালিও না।'

এই হল মনীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। এবং তিনি বেঁচে থাকার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। এইভাবে উদ্দেশ্যহীন হয়ে কেউ বাঁচে ? সারাটা সকাল তিনি এসব নিয়ে ভাবলেন। তারপর বড় মেয়েকে টেলিফোন করলেন। বড়মেয়ে ধরল।' ও বাবা। কি খবর কেমন আছ ?'

'ভাল না। তুই আজ আসতে পারবি একবার ?'

'আমি ? নাগো। আজ পারব না। তোমার নাতনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এই রবিবারে যদি ওর কোন কাজ না থাকে তাহলে ফোন করে যাব।'

টেলিফোন রেখে দ্বিতীয় বার ডায়াল করলেন। ছোট মেয়ে ধরল, 'কে ? ও বাবা, আমি এখনই তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ও আর আমি আজ হলদিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছি। 'সামনের রবিবারে ফিরব। হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল।'

স্ত্রীর কাছে গেলেন মনীন্দ্রনাথ, 'শোন, কলকাতায় আর ভাল লাগছে না। চল কোথায় গিয়ে কিছুদিন থেকে আসি। যাবে ?'

স্ত্রী গল্পের বই পড়ছিলেন, মুখ না তুলে বললেন, 'সারাজীবনে তো অনেক বেড়াতে নিয়ে গিয়েছ আর বুড়ো বয়সে ঢং করতে হবে না। লোকে বলবে কি ?'

'বাঃ, বুড়োবুড়ি তীর্থে যায় না ?'

'এখান থেকে গেলে সংসার সামলাবে কে ?'

'সংসারে তুমি আমি ছাড়া আর কে আছে যে সামলাতে হবে ?'

'আমি কোথাও যেতে পারব না। সামনের সপ্তাহে গুরুদেব আসছেন।'

মন তেতো হয়ে গেল। এখন তার যে বয়স তাতে ঠিক বুড়োদের মত চালচলনে অভ্যস্ত হননি। কপালে ঈষৎ টাক হয়েছে, পেট বেড়েছে কিন্তু এখনও ট্রাম বাসে স্বচ্ছন্দে ওঠা নামা করতে পারেন।

মনীন্দ্রনাথ হঠাৎ ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন। না আত্মহত্যা করার কোন মানে হয় না। মরে গেলেই তো সব গেল। যা যা কর্তব্য করার ছিল তা করা হয়ে গিয়েছে। এখনই এই সংসারে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। অতএব এখন যদি নিজের মত চলেন তাহলে কার কি বলার আছে?

বেলা বারটায় যখন শ্রীমতী বাথরুমে তখন ছোট একটা স্যুটকেসে বেশ কিছু জামা কাপড় ভরে মনীন্দ্রনাথ চেকবই-এর একটা পাতা নিয়ে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে এলেন। সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে তিনি দশ হাজার টাকা তুলে ট্র্যাভেলার্স চেকে বাকিটা নগদে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এখনও স্টেশনে এসে রিজার্ভেশন চাইলেই তা পাওয়া যায়। দিল্লির ট্রেনে উঠে বসলেন তিনি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত চেয়ার কারে বসে মনে হলে এরই নাম শান্তি। কেউ জানবে না তিনি কোথায় যাচ্ছেন। গিন্নি কান্নাকাটি করবেন এবং ভুলে যাবেন। মেয়েরা একটু হৈ চৈ করবে তারপর হিসাব করবে কি ফেলে গেছেন। দুতিনমাস পরে তিনি শুধু নিরুদ্দিষ্টের তালিকায় থাকবেন। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে পারে। বাংলা কাগজে। ব্যাস।

প্যান্ট শার্ট পরে জানলার ধারে বসছেন মনীন্দ্রনাথ। যদিও ভাবে বন্ধ কাঁচ বাইরের জগতটাকে আড়াল করে রেখেছে। ট্রেন ছাড়ার একটু আগে তিনজন যাত্রী উঠল। একটি অল্প বয়সী মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কোন সিটটা?'

মনীন্দ্রনাথ বললেন, যেখানে আমি বসে আছি।'

মেয়েটি ঘুরে বলল, 'আন্টি, তোমাকে প্যাসেজের ধারে বসতে হবে জানালা পেলে না।'

বলতে বলতেই ট্রেন হুইসল দিল। আর আন্টিকে রেখে দুজন দৌড়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে বাই বাই বলতে বলতে। মনীন্দ্রনাথ আন্টিকে দেখলেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। গায়ে চর্বি জমলেও

কি করে সেটাকে কায়দা করতে হয় তা ইনি জানেন। জিনিসপত্র রেখে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, প্যাসেঞ্জের ধারে বসলে আপনার কি খুব কষ্ট হয়?'

'মোটেই না।' মনীন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। মহিলা পাশ কাটিয়ে ভেতরের সিটে বসতে গেলে নাকে সুবাস এল। নিশ্চয়ই বিদেশী পারফিউম। প্যাসেঞ্জের পাশে বসলেন তিনি। আড় চোখে মহিলাকে দেখলেন। মুখে পুরু মেকাপ, জামাটি বেশ সংক্ষিপ্ত ফলে বুকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে হাত গুটিয়ে বসলেন তিনি। ট্রেন চলছে। মনীন্দ্রনাথের মনে হল শীততাপনিয়ন্ত্রিত চেয়ার কারে টিকিট না কাটলেই ভাল হত। চোখ ভরে গাছপালা মাঠ আর আকাশ দেখা যেত। ঘড়ি বলছে সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

'আপনি দিল্লিতে থাকেন?'

পঞ্চাশে পৌঁছে কি করে অত সুন্দর গলার স্বর থাকে? মনীন্দ্রনাথ মাথা নাড়লেন 'না।'

'কাজে যাচ্ছেন?'

'না। বেড়াতে।'

'এই গরমে দিল্লিতে বেড়াবেন?'

'না, না, দিল্লি নয়। মুসৌরি। দিল্লি হয়ে মুসৌরিতে যাব।'

'কি আশ্চর্য। আমিও তো মুসৌরি যাচ্ছি। ওখানে আমার বাড়ি। আমার কর্তা মিলিটারিতে ছিলেন। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে—।' নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। তারপর বললেন, 'প্রতিবছর একবার কলকাতায় আমি বোনের বাড়িতে। সাধারণত শীতকালে আসা হয় এবার গরমে আসতে হল বিয়ে ছিল বলে। আমার নাম দ্রৌপদী মিত্র।'

'দ্রৌপদী?' মহাভারতের বাইরে কোন মেয়ের নাম মনীন্দ্র শোনেননি। 'বাবা রেখেছিলেন। যাজ্ঞসেনী প্রথমে তারপর দ্রৌপদী। আপনি?'

'আমি মনীন্দ্রনাথ। বড় সেকেলে নাম।'

'তাহোক। বেশ ভারী, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল আছে।'

মনীন্দ্রনাথ খুশী হলেন। তাঁর নাম নিয়ে মেয়েরা এবং তাঁদের মা কম বাজে কথা বলেছে।

'ছেলেমেয়ে নেই ?'

তৎক্ষণাৎ দুটি মেয়ের মুখ মনে পড়ল। ওরা কেউ সময় দিতে পারে না তাঁকে। এখন যদি বলেন আছে তাহলে ইনি আরও জানতে চাইবেন। হয়তো চিঠিও লিখে দেবেন বাড়িতে। মনীন্দ্রনাথ ধীরে মাথা নেড়ে চোখ কান বুঁজে বলে দিলেন, 'আমি বিয়ে করিনি।'

'ওমা কেন ? ও বুঝতে পেরেছি।' মহিলা হাসলেন।

'কি ?'

'অল্প বয়সে প্রেমে পড়ে আঘাত খেয়েছেন ?'

'না, না। প্রেম আমি কখনও করিনি।'

'তাহলে ?'

'করা হয়নি এই আর কি ?'

'আপসোস হয় না ?'

'হয়। তারপর ভাবি কি হতো বিয়ে করে।' শুধু অশান্তি বাড়ানো।'

'ও, বিয়ে মানে বুঝি অশান্তি ?'

'তাই তো দেখি। ছেলেমেয়ে বড় হলে স্ত্রী অন্য মানুষ হয়ে যায়।'

'তা অবশ্য বলতে পারব না। কারণ ঈশ্বর আমাকে ছেলেমেয়ে দেননি।'

মনীন্দ্রনাথের মহিলার জন্যে কষ্ট হল। সন্তানহীনা বিধবার নিশ্চয়ই অনেক দুঃখ।

'চাকরি করেন ?'

'করতাম। এখন বিশ্রাম।'

'একাই থাকেন।'

'ঠিক একা নয়। দুঃসম্পর্কের আত্মীয়রা আছে।'

'বিয়ে করলে অন্তত বউ থাকত পাশে।'

'মনের মত বউ না হলে সর্বনাশ হত।'

মনীন্দ্রনাথের কথা শুনে বেশ হাসলেন মহিলা। তারপর বললেন, 'ইউরোপ আমেরিকায় বয়স হলে বিজ্ঞাপন দিয়ে পার্টনার যোগাড় করে অনেকে লিভ টুগেদার করে। না চললে ছাড়াছাড়ি। তাই করতে পারেন।'

'ও বাবা, বাংলাদেশে অমন বিজ্ঞাপন দিলে লোকে মারবে।'

'তা অবশ্য ঠিক কথা।'

'মুসৌরিতে আপনার সঙ্গে কে থাকে?'

'একটি পাহাড়ি মেয়ে আছে। সেই সব করে। ওর ভরসায় মুসৌরি ছাড়ি।'

'আপনি একা থাকতে ভালবাসেন?'

'মোটেই না। সারাজীবন হৈ চৈ করেছি। উনি খুব আড্ডাবাজ ছিলেন। বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে পার্টি হত। ওঃ, কি দারুণ দিন ছিল সেসব।' ফস করে নিশ্বাস ফেললেন দ্রৌপদী।

গল্পে গল্পে সময় কাটল। দ্রৌপদীর ছোট কুকুর যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রতি রাত্রে ঘুমোন তার নাম 'জনি'। কাজের মেয়েটা এর মধ্যে তিন বার স্বামী চেঞ্জ করেছে। এসব খবর তিনি পেয়ে গেলেন। দ্রৌপদীর তিনখানা ঘর, সামনে লন। লনে বসলে সূর্যাস্ত দেখা যায়। কিন্তু ওঁর বাসনা সুর্যোদয় দেখা। এরকম অনেক কিছু জানলেন তিনি।

রাত্রের খাবার এল। তৃপ্তি নিয়ে খেলেন তিনি। খাওয়ার পর মহিলা ব্যগ থেকে ছুটো ট্যাবলেট বের করে একটা খুলে ফেলে অন্যটা এগিয়ে দিলেন, 'নিন চুষে খেয়ে নিন। অম্বল হবে না।'

মুখে দিয়ে খুব খুশি হলেন মনীন্দ্রনাথ, আপনার অম্বল আছে বুঝি?'

'না, না। আমার শরীরে কোন রোগ নেই। তবে ট্রেনের খাওয়া বলে একটু সাবধান হওয়া ভাল। প্রিভেনশন ইজ বেটার ছ্যান কিওর।'

রাত্রে ঘুম হল ভাল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে হল, 'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি'। মহিলা ঘুমাচ্ছেন। তাঁর মাথা মনীন্দ্রনাথের

কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। তিনি একটা চাদর গায়ের ওপর মেলে দিয়েছেন যার প্রান্ত মনীন্দ্রনাথের কোলে। ঘুমের আগে মনীন্দ্রনাথ মনে করতে পারলেন না। ঘুম ঘুম শান্তির ঘুম।

মুসৌরিতে বাস থেকে নেমে মনীন্দ্রনাথ দ্রৌপদীকে বললেন, 'মাঝে মাঝে যদি আপনার বাড়িতে বেড়াতে যাই আপত্তি নেই তো?'

দ্রৌপদী বললেন, 'না না। কিন্তু আপনি কোথায় উঠবেন?'

'একটা হোটেলে। তারপর ঘর ভাড়া করব?'

'ঘর ভাড়া? আপনি কি অনেকদিন এখানে থাকবেন?'

'সেই রকম ইচ্ছে আছে।'

'বাঃ তাহলে হোটেলে কেন? আমি ভাবছিলাম আমার বাড়ির একটা ঘর ভাড়া দেব কাউকে। আপনি আমার ওখানে থাকতে পারেন।'

'সে তো খুব ভাল, কিন্তু খাওয়া দাওয়া?'

'কিচেন তো একটাই। আচ্ছা, আপনি পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকুন। মাসে পাঁচশ টাকা দেবেন। আপত্তি আছে?'

'বিন্দুমাত্র নয়।'

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে হুইস্পারিং উইণ্ডোরে সামলে দিয়ে ওরা চলে এলেন অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকায় যেখানে দ্রৌপদীর কটেজ। পাহাড়ি মেয়েটি ছুটে এল। জিনিসপত্র রেখে দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তোর বরের খবর কি?'

'ওকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'ও খুব মদ খায়।'

'ওমা, তাতেই ছাড়লি?'

'হ্যাঁ। রাত্রে আমাকে জেগে থাকতে হয় আর ও নেশায় ঘুমোয়।'

'হু। এখন তুই কি করবি?'

'আর একটা বিয়ে করব। ও মদ খায় না। খুব শক্ত পুরুষ।'

মনীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে কথাগুলো শুনে মেয়েটিকে দেখলেন। বেশ

সাধারণ চেহারার পাহাড়ি মেয়ে। একটার পর একটা স্বামী খুঁজছে সুখের জন্য।

মনীন্দ্রনাথের ঘরটি ভাল। কাঁচের জানলা আছে। সুন্দর বিছানা। তাতে কিছুক্ষণ শুয়ে মনীন্দ্রনাথ হিসাব করছিলেন। ষোল মাসতো খুব স্বচ্ছন্দে কাটবে তার। ষোল মাসে আট হাজার টাকা। বাকিটা হাত খরচ। তারপর দেখা যাবে।

দিন সাতেক চমৎকার কাটল। সকালে ব্রেক ফাস্ট করে মনীন্দ্রনাথ যখন বেড়াতে বের হল তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা এবং কথা হয়। দুপুরের লাঞ্চ তাঁর ঘরে আসে। এখন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি লিখছেন। আর এই পৃথিবী, আকাশ আর সূর্যের সঙ্গে শীতের সহাবস্থান উপভোগ করছেন চুটিয়ে। সারাদিন ঘুড়ে বেড়ান মুসৌরির পথে পথে। সংসার ছেড়ে আসার জন্যে তাঁর কোন অনুশোচনা নেই। মনে হচ্ছে মুক্ত জীবন পেয়েছেন তিনি। দ্রৌপদী তাঁকে একদম বিরক্ত করেন না। অপ্রয়োজনে কাছে আসেন না। শুধু ব্রেক ফাস্ট এ টেবিলে দেখা হয়, কথা হয়, এবং ওই পর্যন্ত। মনীন্দ্রনাথ ভাবেন কলকাতার কথা। স্ত্রী এবং মেয়েরা কি এর মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছে? হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ?

সাতদিনের মাথায় ঘটনাটা ঘটল? কাজের মেয়েটি রান্নাবান্না করে তার নতুন স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে ছুটি নিয়ে চলে গেল। রাতের খাবার ঘরে এল না। খিদে পেয়েছিল খুব। মনীন্দ্রনাথ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং রুমে এলেন। কেউ নেই। কি করবেন বুঝতে না পেরে দ্রৌপদীর ঘরে নক্ করলেন। দরজা খোলাই ছিল। দ্রৌপদী ঘরে আসতে বললেন।

মনীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে দেখলেন দ্রৌপদী টিভি দেখতে দেখতে মদ্যপান করছেন। আজ পর্যন্ত কোন নারীকে তিনি মদ্যপান করতে দেখেননি। দ্রৌপদী তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। জীবনে কখনও সে মদ্যপান করেননি মনীন্দ্রনাথ। কিন্তু স্রেফ কৌতূহলের বশে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মুখোমুখী বসলেন।

খেয়াল হল যখন তখন মধ্যরাত। তিনি দ্রৌপদীর দুই হাতের বাঁধনে শুয়ে আছেন। বড় আরাম লাগছিল তাঁর। একটি নারী শরীর তাঁর এত কাছে। শ্রীমতী মনীন্দ্রনাথ তাঁকে এই সুখ দেননি ইদানীং। আর তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল দ্রৌপদীর। তিনি বললেন, আর একা থাকতে পারছি না গো। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? স্টে গেট টুগেদার। আমার আর বাচ্চা হবে না।' ঘুম জড়ানো কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলেন মনীন্দ্রনাথ। তার শরীর এই মুহূর্তে পাঁচ বছরের শিশুর মতন। কোন সাড়, কোন উত্তেজনা নেই। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন, দৈনিক কলহ, নিত্য অশান্তিতে যে সুখ আছে তার অতিরিক্ত কোন শারীরিক সুখ পাওয়ার অধিকারী তিনি নন। চুপচাপ জেগে রাতটা কাটিয়ে দিলেন তিনি। পরদিন প্রত্যুষে দ্রৌপদীর ঘুম ভাঙ্গার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরলেন মনীন্দ্রনাথ। কলকাতার।

সে-স্মৃতি বড় আবছা। এই মুহূর্তে মা কিংবা বাবা কাছে নেই যে জিজ্ঞাসা করব বছরটা কত পুরোনো। কিন্তু মনে পড়ছে আইডিয়াল হোম হোটেলের কাছে একটা সিনেমা হাউসে তখন 'কবি' চলছিল। আমরা দেখতেও গিয়েছিলাম। কি দেখেছিলাম তা খেয়ালে নেই। কিন্তু ওই হোটলে থাকাকালীন সেই বালক আমি এক দুপুরে হারিয়ে গিয়েছিলাম। পিতৃদেব বেরিয়েছিলেন, জননী ঘুমিয়ে, চুপচাপ তিনতলা থেকে নেমে এসেছিলাম মির্জাপুর স্ট্রীট। উল্টোপিঠেই ছিল একটা ফটো বাঁধানোর দোকান। সেখানে সুভাষচন্দ্রের ছবি ছিল। ছবিটা আমাকে টেনেছিল খুব। পরে এসব গল্প শুনেছি। চেঁচামেচি কান্নাকাটি খোঁজ খবর এবং সবশেষে ছবিসুদ্ধ আমাকে নিয়ে যাওয়া। ওই ছবিটা দীর্ঘদিন আমাদের চা-বাগানের বাড়িতে টাঙানো ছিল। চার কি পাঁচ বছরের বালকের প্রথম পছন্দ যদি সুভাষচন্দ্রের ছবি হয় তবে বড় হলে সে কি না হবে, এমন ধারণা হয়েছিল পিতামহের। অথচ কিছুই হওয়া হল না।

প্রথম কলকাতায় আসার স্মৃতি যদিও এত কৃপণ কিন্তু সেই বালক যখন তরুণ, জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া পাঠাগার তাকে একটার পর একটা বই দিচ্ছে যাতে কলকাতা শহর ছাড়িয়ে তখন তার মনে আকর্ষণ তীব্রতর হচ্ছে। বলা ভাল সেই 'দীপালী', 'সচিত্র ভারত' পত্রিকা থেকে শুরু করে 'দেশ' আর 'উল্টোরথ' সে গিলে খেত ক্লাস নাইন থেকেই। সম্ভবত পিতামহ এবং পিসীমার কাছে একা থাকার সুবাদে পাঠের অভ্যাস বেড়ে গিয়েছিল। সাহিত্যের বাসনা মাথায় ছিল না মোটেই। তখন পথের পাঁচালি হয়ে গিয়েছে, জলপাইগুড়ির রূপশ্রী হলে অপুর সংসারও পৌঁছে গিয়েছে। আর গল্প চাউর হয়েছে সত্যজিৎ বাবু নাকি পথে-ঘাটে পছন্দসই ছেলে দেখলে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করেন, 'কি নাম ভাই?' 'শাপ মোচনের' হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শার্ট আর ধুতি পরে অদ্ভুত গ্ল্যামার ছড়িয়ে ফাংশন করতে আসেন জলপাই-গুড়িতে দু বছর অন্তর। জুলজুল করে চেয়ে দেখতো সেই তরুণ। সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, আপনার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যে থাকে কোথায়? না সেই শহরে যার নাম কলকাতা। সেই শহর যেখানে কিনু গোয়ালার গলিও আছে। পড়াশুনায় মন নেই তবু স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফলটা তো এল কলকাতা থেকেই। সেটা শোনার পর, সেদিন আকাশ ভাঙ্গা জল, ভিজে ভিজে যেন মেঘ ধরার চেষ্টায় ঘুরে বেড়ানো। আমার কপালে ছিল আনন্দ চন্দ্র কলেজ, পিতৃদেবের সামর্থ্যে টান পড়ছিল এর বেশী কিছু করতে। কিন্তু পিতামহ আদেশ দিলেন উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতায় যেতে হবে। সেখানে ভাল শিক্ষক, শিক্ষার সঙ্গত পরিবেশ এবং বুদ্ধিমান ছাত্রদের সমাবেশ। ঠিক হল আমি ইংরেজি অথবা অর্থনীতিতে পণ্ডিত হব।

সে বড় উন্মাদনার সময়। কলকাতার ডাক পেয়ে যাই। দীপক পাল নামে একটি ছেলে আমার সঙ্গে যাবে কলকাতায়। সে পাশ করেছে ভাল ভাবে বিজ্ঞান নিয়ে। পিতৃদেব তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখলেন। তিনি বউবাজারে এক মেসে থাকেন। আমাদের অভিভাবক হবেন তিনি। সম্মতি জানিয়ে তাঁর চিঠি এল। চা-বাগানে গিয়ে পিতৃদেবের কাছ থেকে শ'তিনেক টাকা এবং মাতৃদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে এলাম। সেই সময়, উনিশশো ষাট সালে সতর বছরের দুটি তরুণ শতরঞ্চিতে বিছানা আর টিনের ট্রাঙ্কে জামা কাপড় পুরে দিল। মনে আছে জামাকাপড় বলতে ছিল দু'জোড়া ধুতি আর দুটি নীল ফুলহাতা শার্ট, দুটো ফুল প্যান্ট আর দুটো শার্ট। পিতামহ উপদেশ দিলেন টাকাকড়ি সযত্নে রাখতে কারণ কলকাতায় চোর-পকেটমার নাকি থিক-থিক করছে। আর বিধবা পিসীমা সারা সকাল অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে কাঁদার পর বলেছিলেন, 'মেয়েদের সঙ্গে মিশবি না। কলকাতার মেয়েদের থেকে সাবধান থাকবি। যদি কখনও কথা বলতে হয় তাহলে পায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলবি। যেভাবে লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে কথা

বলত।' ঘাড় নাড়তে হয়েছিল বারংবার। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মাথায় হাত রেখে জপ করেছিলেন। দুর্গা দুর্গা বলে যাচ্ছিলেন যতক্ষণ আমি শুনতে পাই। পিতামহ এসেছিলেন স্টেশনে। তখন হলদিবাড়ি থেকে লোক্যাল ট্রেনের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর কোচ জুড়ে দেওয়া হত। সেইটে মিলত শিলিগুড়িতে দাঁড়ানো নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে। ওই কোচে ওঠার জন্যে মারপিট হত সেই যুগে। ট্রেন ছাড়লে দেখা যেত একজনকে তুলতে এসেছিল দশজন।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে পিতামহকে প্রণাম করেছিলাম। গম্ভীর দৃঢ় মানুষটি বলেছিলেন, 'এখন থেকে তোমার অভিভাবক তুমি নিজে। জীবনে ভাল আছে মন্দও আছে। আমি শুধু বলব, মানুষ হও।' সেই সন্ধ্যায় যখন আলোকিত জলপাইগুড়ি স্টেশন, তিন নম্বর গুমটি ছাড়িয়ে ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল শিলিগুড়ির দিকে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত বিষণ্ণতা গ্রাস করেছিল আমাকে। কলকাতায় যাওয়ার উত্তেজনা তখন উধাও। হয়তো শেকড় তোলার মুহূর্তে গাছেদের এমনটা হয়।

তখন জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছাতে চব্বিশ ঘণ্টা লাগত। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি। তখন রাত নেমেছে। আমরা দুই তরুণ তখন বিষন্নতা সরাতে শুরু করেছি। কামরায় অনেক জায়গা। ঠিক উল্টোদিকে একটি পরিবার কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছেন। আমি আর দীপু বাড়ি থেকে আনা খাবার ভাগ করে খেলাম। স্টেশনে অনেক আলো। সুবেশ মানুষের ভিড়, আমাদের সঙ্গে কোন অভিভাবক নেই। আহা! ট্রেন ছাড়ল। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। ভদ্রমহিলা গালে হাত দিলেন, 'ওমা! এইটুকুনি ছেলে একা একা কলকাতায় যাচ্ছ!' খুব রেগে গিয়েছিলাম। নাইট শোয়ে চুরি করে সাগরিকা, সূর্যতোরণ দেখে ফেলেছি। উত্তমকুমার কিভাবে কথা বলেন তাও নকল করতে পারি। আর সেই আমাকে কিনা একটা পনের বছরের ডলপুতুল মার্কা মেয়ের সামনে বলা হল বাচ্চা ছেলে! হ্যাঁ ওই পরিবারে ওই রকম মেয়ে ছিল। ওপরের ব্যাঙ্কে শুয়ে শুয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন।

ভোর হল। কুলিদের হাঁকাহাঁকি, যাত্রীদের ব্যস্ততা, গঙ্গার চরে হোগলার ছাউনি দেওয়া হোটেলে গরম চায়ের আমন্ত্রণ। সেসব ছাড়িয়ে ভারী ট্রাঙ্ক আর শতরঞ্জির বিছানা দুহাতে নিয়ে বালি পেরিয়ে টলতে টলতে পৌছালাম স্টিমারে। সকালের রোদ মেখে সেটা সিটি বাজিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। নিচের তলায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। দ্বিতীয় আর প্রথম শ্রেণীর জন্যে ওপরতলা কয়েক মিনিটের ভেতর যাত্রীতে হৈচৈ করতে লাগল স্টিমার। মুখ ধুয়ে চা খেলাম। আহা, অমৃত। সকাল পেরিয়ে গঙ্গার এপ্রান্তে এলাম। সকরিগলি থেকে মনিহারিঘাট। আবার ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ নীতি মেনে ছোটা। জায়গা দেখা। ট্রেন ছাড়ল। বেলা দেড়টায় রামপুরহাট স্টেশনে নেমে ভাত ডাল মাছের তরকারি খাওয়া। তার আগে তিনপাহাড়ের চা। সাইথিয়া হয়ে বোলপুর। আমরা দুজনে দুটো জানলার পাশে বসে মাঠ গাছ স্টেশন গিলছি। যখন ট্রেন কোন সেতুর ওপর ওঠে তখনই দীপু সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে নদীর নাম। ভূগোলের বই থেকে তারা উঠে আসে।

তারপর দক্ষিণেশ্বর। গঙ্গাদর্শন। দূরে মায়ের মন্দির। ট্রেনভর্তি লোক হাত জোড় করে প্রণাম জানাচ্ছে। নিচে একটা বাস পেরিয়ে গেল। বাসের ওপর লেখা এসপ্ল্যানেড। দীপু ফিসফিস করে বলল, 'আমরা কলকাতায় এসে গেছি-রে।'

চারপাশের প্রকৃতি পাল্টে খেল। গাছ মাঠের বদলে থিকথিকে বাড়ি আর তা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আলো। যেন আলোর নগরীতে ঢুকে যাচ্ছে ট্রেন। জলপাইগুড়ির রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটি টিমটিমে আলো জ্বালাত। শেষ পর্যন্ত ট্রেন এসে থামল শিয়ালদহ স্টেশনে। চারপাশে এত চিৎকার চেঁচামেচি যে আমরা রইলাম চুপচাপ বসে। একটা বুড়ো কুলি আমাদের সঙ্গ ছাড়বেই না। দীপু ভয় পাচ্ছিল তাকে জিনিষ বইতে দিতে। যদি ভিড়ের ভেতর মিলিয়ে যায়। স্টেশন আমাদের নিতে আসার কথা পিতৃবন্ধুর। কিন্তু স্টেশনটা এত বড় কে জানত। কোথায় তিনি। সাড়ে পাঁচটায় নেমেছি, সাড়ে ছটায় তাঁর দেখা নেই। দীপুর মুখ শুকিয়ে আমসি, 'কি হবে রে!'

সেই ঝাপসা স্মৃতির গর্বে স্মার্ট হলাম আমি, 'ঠিকানা তো জানি। কলকাতায় ঠিকানা থাকলেই পৌঁছানো যায়।' অতএব কুলিকে ধরলাম। বউবাজার ষ্ট্রীট নাকি খুব কাছেই। হেঁটে যাওয়া যায়। আমরা দুই তরুণ নবীন পথিক হয়ে হাঁটা শুরু করলাম। একেই ট্রাম বলে? এত ভিড়? ওই খানে মানুষ কি করে ওঠে? গাড়ির দঙ্গল পেরিয়ে রাস্তার ওপারে যাব কি করে?

দুপাশে সোনার দোকান, যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। একে জিজ্ঞাসা করি তো ওকে। হদিস পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত ট্রামরাস্তার ডানদিকের গলির মুখেই রেইনবো হোটেল পেয়ে গেলাম। এখানেই পিতৃবন্ধু থাকেন। ঢোকামাত্র এক ভদ্রলোক পরিচয় জানতে চাইলেন। জানানোর পর তিনি বললেন, 'আরে তোমাদের আনতে তো অনিলবাবু স্টেশনে গিয়েছেন। দোতলার কোণের ঘরটায় তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। চলে যাও, দুটো খাট খালি আছে। দোতলার কোণে বাথরুম পায়খানা। আটটার সময় নিচের খাবার ঘরে এলে খেতে পাবে।'

দোতলার কোণের ঘর বউবাজার ষ্ট্রীটের দিকে নয়। কুলিকে বিদায় করে খাটে বিছানা করে শুয়েছি দুজন, এইসময় ধুতি শার্ট পরা এক ভদ্রলোক তড়িঘড়ি ঢুকলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে সমরেশ? তুমি? কি আশ্চর্য, এতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি অথচ তোমাদের দেখতে পেলাম না? আমি তো ভাবলাম তোমরা আসইনি। কোন অসুবিধে হয়েছে?'

আমরা প্রণাম করলাম তাঁকে। এই মরুভূমিতে তিনিই একমাত্র মরূদ্যান। মিনিট দশেক ধরে তিনি উপদেশ দিলেও বুঝতে পেরেছিলাম মানুষটি ভাল। মেসের থাকা খাওয়ার নিয়ম জানিয়ে দিলেন। যেহেতু অল্পদিন সেখানে থাকব তাই আমাদের পরিচয় তাঁর অতিথি। তিনি প্রেসিডেন্সি সেন্ট পলস্ এবং স্কটিশ কলেজের নাম বললেন। আগামী-কাল ওই তিনটে কলেজে গিয়ে ভর্তি হবার ফর্ম নিয়ে আসতে হবে। বিদায় নেওয়ার আগে বলে গেলেন আমরা ঠিক সময়ে খেয়ে শুয়ে পড়ি

কারণ আমাদের সঙ্গে ওই রাতে তাঁর আর দেখা হবে না। তাস খেলার নেশা আছে তাঁর।

আমরা এখন কলকাতা শহরে। যতখানি উত্তেজিত ছিলাম ততটা প্রকাশ করতে পারছি না। ওই ঘরে আরও একটি খাট আছে। খাটের মালিক নেই। ওপাশের জানলাটা বন্ধ। দীপু সেটাকে খুলে বলল, 'কি দারুণ কলকাতা।' আমি শুয়েছিলাম। হঠাৎ দীপুর উত্তেজিত গলা কানে এল, 'সমরেশ, তাড়াতাড়ি, শিগ্গির।

লাফ দিয়ে পৌঁছে গেলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দীপু বলল, 'গ্যাখ।'

দেখলাম। লম্বা গলি চলে গিয়েছে। গলিটা বেশ সরু। আর গলির দুধারে প্রায় লাইন করে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়। বেলফুলওয়ালা হাঁকছে। জলপাইগুড়িতেও একটি বারাঙ্গনাপাড়া ছিল। সেদিকে পা বাড়ানো অপরাধ হিসেবে গণ্য হত। একবার খেলার মাঠ থেকে শর্টকাট করার অছিলায় মন্টির সঙ্গে ওপাশে গিয়েছিলাম। শীর্ণ দরিদ্র কয়েকটা মেয়েকে দেখে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। উর্বশী রম্ভা মেনকার যে ছবি আঁকা ছিল মনে তার সঙ্গে সাতসমুদ্র ফারাক ছিল তাদের চেহারার। কিন্তু জানলায় দাঁড়িয়ে মনে হল এরা যেন পাল্লা দিতে পারে। হাসি দেখে সবাইকে সুখী মনে হচ্ছে। দীপু বলল, 'তাই জায়গাটার নাম বউবাজার, না?'

এইসময় পেছন থেকে একটি গলা ভেসে এল, 'উঁহু, ওই জানলা খুললে চরিত্র ঠিক থাকে না। আমি তাই বন্ধ রাখি।'

দেখলাম বছর পঁচিশের এক সৌম্য চেহারার যুবক দাঁড়িয়ে। আলাপ হল। নাম দিলীপ বসু। ব্যবসা করেন। কলকাতায় প্রথম একা এসেছি শুনে বললেন, 'তাহলে তো আজকের রাতটা সেলিব্রেট করা দরকার।' লোকটিকে আমার খুব ভাল লাগল। ওঁর কাছে জানলাম এই মেসের পেছনদিকটা বারবনিতা পাড়া। সন্ধ্যের পর ওদিকে না যাওয়াই ভাল। সামনের বউবাজার স্ট্রীটটাকেই ব্যবহার করা উচিত।

দীপু জিজ্ঞাসা করল, 'কত মেয়ে থাকে ওখানে ?'

'হিসেব নেই। হাড়কাটা, সোনাগাছি, রামবাগান, খিদিরপুর, খাল্লায় যারা থাকে তাদের গোনা যায় কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় যারা ছড়িয়ে আছে লুকিয়ে চুড়িয়ে তাদের গুণবে কে ? ওই যে বউবাজার স্ট্রীট, এর এপারে তো এত কাণ্ড, ওপারে হল খাস বাঈজী পাড়া। গান বাজনা নাচ, সব নবাবী ব্যাপার। রইসী মানুষেরা আসেন। থাকো, আস্তে আস্তে সব জেনে যাবে। তবে একটা কথা, কলকাতায় থাকতে হবে হাঁসের মত। পালকে জল বসতে দেবে না। শ্রীকান্ত পড়েছ ?'

মাথা নাড়লাম। দিলীপবাবু বললেন, শ্রীকান্ত যেমন সব দেখত কিন্তু কোথাও ভেতরে ঢুকে জড়িয়ে পড়ত না, ঠিক তেমন। নইলে কলকাতায় টিকতে পারবে না।

মেসের খাওয়া প্রথম রাত্রে খেয়ে চোখে জল এলো। পোস্তর ঝোল গড়িয়ে যাচ্ছে থালার একপাশে, কলাইকরা থালা, মাছের ঝোলের স্বাদ কি বিচ্ছিরি। দীপুরও এক অবস্থা। দিলীপবাবু বললেন, 'খিদের জ্বালায় এইটাই অমৃত লাগবে কদিন পরে।' খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘুম পেয়েছে ?'

কিছুই পাচ্ছিল না। জানাতেই তিনি বললেন, 'চটপট রেডি হয়ে নাও। সিনেমা দেখে আসি। মেট্রোতে। প্রথম রাতটা মনে রাখবে চিরদিন।'

আমি এক পায়ে খাড়া। কিন্তু দীপু আমাদের অভিভাবকদের কথা ভাবল। দিলীপবাবু জানালেন, তাঁকে কাল সকালের আগে নাকি আমরা দেখতে পাব না। অবশ্য সেকথা তিনি নিজেও বলেছিলেন।

সার্ট প্যাণ্ট পরে সেজেগুজে আমরা তিনজন বেরুলাম। রাস্তায় তখন ভিড় কমছে। পথ চিনিয়ে চিনিয়ে দিলীপবাবু আমাদের ধর্মতলায় নিয়ে এলেন। মেট্রো সিনেমায় তখনও বিদেশী গন্ধ। আমরা যেন অমরাবতীতে পৌঁছে গিয়েছি। ছবিটির নাম ছিল "পিলো টক।" রক হাডসন নায়ক ছিলেন বলে মনে পড়ছে। টিকিট কাটতে গিয়ে

দিলীপবাবু পয়সা নিলেন না। আমরা ছবি দেখলাম। সিনেমা হলে পায়ের তলায় কার্পেট থাকে এ অভিজ্ঞতা সেই প্রথম।

এগারটায় ছবি ভাঙল। আমরা তিনজন গল্প করতে করতে আসছি। দিলীপবাবু ইংরেজি ছবির পোকা। হলিউডের গল্প বলে যাচ্ছেন। রাস্তা নির্জন। হুস হাস গাড়ি যাচ্ছে, মেসের সামনে যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে এগারটা। মেইন গেট বন্ধ। দিলীপবাবুর সঙ্গে দারোয়ানের আঁতাত ছিল। অতএব ঢুকতে অসুবিধে হল না।

রাত্রে ঘুম এল না। এর মধ্যেই কলকাতাকে চেনা-চেনা লাগছে। দীপু ঘুমাচ্ছে। দিলীপবাবুও। বউবাজারের দিকে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সারা শহর নিস্তব্ধ। একটা পানের দোকান খোলা। চুপচাপ দেখছিলাম। এই শহরে এখন আমাকে থাকতে হবে। হঠাৎ একটা মাতালকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। লোকটা টলছে। পানওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে সে দুটো পকেট ওল্টালো, 'কিস্যু নেই, সব নীহারবালা নিয়ে নিয়েছে। একটা সিগারেট খাওয়াবে? ফিরি?'

পানওয়ালা ধমকালো, 'ভাগো। মাতাল কাঁহিকা।'

লোকটা হাসল, 'আমি দেবদাস। মুস্কিল হল আমার চুণীবাবু নেই। তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে একটা চুণীবাবু দরকার। সিঁড়ি। স্বর্গের নরকের। সিঁড়ি চাই। সিঁড়ি দেবে গা? একটা সিঁড়ি!' লোকটা হেঁকে হেঁকে হেঁটে যাচ্ছিল।

আঠাশ বছর পরে এখনও সেই মাতালের মুখ মনে পড়ে। একজন সত্যবাদী মাতালের মুখ।